ডাক্তার জীমূতমোহনের বিচিত্র জগৎ



স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈতালী প্রকাশনী
৭, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

Dr. Jimut Bahaner Bichitra Jagat.

-by Swapan Bandyopadhya

প্রথম প্রকাশ ঃ

২৩শে আষাঢ় গুরু পূর্ণিমা—১৩৬১

প্রকাশক ঃ

শ্রী অজিত কুমার গুপ্ত

চৈতালী প্রকাশনী

৭নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন

কলিকাতা—৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ

রাহুল মজুমদার

মুদ্রক ঃ

শিবশক্তি প্রেস

২৮/জি অবিনাশ ঘোষ লেন

কলিকাতা—৭০০০০৬

পরিবেশক ঃ

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী

৩৬, কলেজ রো

কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রকাশকের নিবেদন

কল্পবিজ্ঞানের গল্প আজকাল সব বয়সী পাঠকের কাছেই জনপ্রিয় হয়েছে। এমন কাহিনী লিখে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাঙালী পাঠকের মনে স্থান করে নিতে পেরেছেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই বিভিন্ন স্বাদের পাঁচটি বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান কাহিনী এই সংকলনে প্রকাশ করা হল। গল্পগুলি ইতিপূর্বেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত।

প্রসঙ্গত: বর্তমান নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ছাপার কাজ চলায় অনেক যত্ন সত্ত্বেও বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল। এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি অবশ্যই সংশোধিত হবে।

এতে আছে—

পরম পূজ্য

মা ও বাবার

করকমলে

এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য

দ্বিতীয় বিশ্বের অভিযাত্রা

চিল্কার চিংড়ি বিভীষিকা

তিব্বতী গুম্ফার রহস্য

পুরুষ বর্জিত নাটক (একাঙ্ক সংকলন)



এক

[সমুদ্রের ধারে অশ্চর্য দৃশ্য]

একা একা বসে সূর্যাস্ত দেখছিলাম। সেই সময়ই দেখলাম লোকটাকে। পশ্চিম আকশে লাল আবীর ছড়িয়ে সূর্যটা যখন টুপ করে ডুবে গেল—লোকটার প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি আকৃষ্ট হল আমার। কালো ছিপছিপে লম্বা চেহারা, সমুদ্রের ধারে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রথমটা মনে করলাম স্থানীয় কোন গরীব মানুষ—ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে—এখানকার বাজারে বেচে আমাদের মত টুরিষ্টদের কাছ থেকে দু'পয়সা কামাবে বলে। কিন্তু তাহলে ওর চালচলন অমন অদ্ভুত কেন? কৌতূহলী দৃষ্টিতে কিছুক্ষন তাকিয়ে থেকে বুঝলাম, ঝিনুক কুড়োনো ওর উদ্দেশ্য নয়—সমুদ্রের ধারে বালির উপর যে গর্তগুলো রয়েছে, তার প্রতিটি গর্তের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ও কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে··· ওর মুখচোখের চাউনি, চলা-ফেরার ভঙ্গিও কেমন যেন—ঠিক মানুষের মত ভাবা যায় না।

হঠাৎ বুঝতে পারলাম লোকটার মতলব। একটা গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বড় সড় একটা জ্যান্ত কাঁকড়া বার করল—এবং কী আশ্চর্য! তিলমাত্র দ্বিধা না করে জ্যান্ত কাঁকড়াটার দাঁড়াগুলো মট মট করে

ভেঙে মুখে পুরে দিল লোকটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আস্ত কাঁকড়াটা ওর পেটে চলে গেল এবং তারপর একটা তৃপ্তির উদ্গার তুলে কোনদিকে দৃকপাত না করে এগিয়ে চলল আগের মতই বালির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে।

বিস্ফারিত, দৃষ্টি মেলে দেখছিলাম দৃশ্যটা।

হঠাৎ দূর থেকে একটা ডাক শুনলাম, আয়, —আয় জ্যাকি।

তাকিয়ে দেখি—দূর থেকে এক থুর থুরে বুড়ো লোকটার দিকে এগিয়ে আসছে। তার মাথায় ধবধবে সাদা চুল, সাদা দাড়ি প্রায় বুক ছুঁয়েছে, পরনে একটা সেকেলে প্যাটার্নের ঝলমলে তালি দেওয়া প্যান্ট, সার্ট, পায়ে চটি। বৃদ্ধের এক হাতে একটা কুকুর বাঁধা চেন, অন্য হাতে চাবুক।

বৃদ্ধকে দেখেই লোকটা সচকিত হল, তারপর দুর্বোদ্ধ কি একটা উচ্চারণ করে ছুটে গেল বৃদ্ধের দিকে। বৃদ্ধ ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে কি বলছেন দূর থেকে শোনা গেল না, কিন্তু ব্যাপারটা দেখলাম কোন পোষা প্রানীকে আদর করার মতই।

তারপর ওরা দুজনে ধীরে ধীরে দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেল।

দুই

[হিমাংশুর হোটেল]

কাহিনীটা আচমকা শুরু করে ফেলেছি। গোড়ার কথাটা একটু বলে নেওয়া দরকার।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, আমার বন্ধু হিমাংশু কয়েক বছর হল উড়িষ্যা রাজ্যের সমুদ্র তীরবর্তী গোপালপুরে একটা হোটেল খুলে বসেছে। পুরী থেকে চল্লিশ মাইল দূরে সমুদ্র ধারের এই জায়গাটা বেশ মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর। টুরিস্ট সেণ্টার হিসেবে খুব বেশীদিন গড়ে ওঠে নি—তাই জনকোলাহল আর ভিড় এখনও এখানকার প্রকৃতির শান্তি বিশেষ নষ্ট করতে পারেনি। বেড়ানোর পক্ষে এমন

জায়গাই আমার পছন্দ। হিমাংশু বেশ কয়েকবারই চিঠি লিখে আমায় এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, কিন্তু কেরানী জীবনের নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আসা আর হয়ে উঠছিল না এবার বলতে কি এক রকম তেড়ে ফুঁড়েই চলে এসেছি।

সমুদ্রের প্রায় ধারেই হিমাংশুর হোটেল "সাগর দর্শন"। এসেছি সবেমাত্র গতকাল। আমি যে সত্যিই এভাবে শেষ পর্যন্ত আসব, হিমাংশু বোধ হয় ভাবতে পারে নি—ওর খাতির যত্নের বহরটা দেখে তাই মনে হল।

স্কুল জীবনের সহপাঠী হিমাংশু এককালে আমার সব থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

হিমাংশুকে সেই রাত্রেই খাবার টেবিলে বসে সন্ধ্যেবেলা সমুদ্রের ধারে দেখা ঘটনাটার কথা বললাম।

হিমাংশু দেখলাম অবাক না হয়ে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, তুই নিশ্চয়ই ডাক্তার জীমূত বাহন আর ওঁর সঙ্গী জ্যাকিকে দেখেছিস।

বিষয়টা এতে পরিষ্কার হবার কথা নয়। বললাম, ডাক্তার জীমূত বাহন কে?

হিমাংশু হাই তুলে বলল, আজ অনেক রাত হল। তোর নিশ্চয়ই ঘুম পেয়েছে। বরং কাল সকাল বেলা ডাক্তার জীমূত বাহনের কথা তোকে শোনাব। ভারি ইণ্টারেস্টিং।

বুঝলাম, বন্ধু এখন মুখ খুলতে চায়না। টুরিস্ট সীজন শুরু হয়েছে। সারা দিনের পরিশ্রমে ওর ক্লান্ত থাকাই স্বাভাবিক তাই আর কিছু না বলে সে রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানায় লম্বা হলাম। খাওয়ার ব্যবস্থাটা হিমাংশু ভালই করেছিল সরু বাসমতী চালের ভাত, চিংড়ি মাছের মালাই কারী আর পাতের শেষে দই।

বিছানায় শুয়ে ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে বেশী দেরী হল না।

তিন

[ডাক্তার জীমূত বাহন]

পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে হিমাংশুর কাছ থেকে ডাক্তার জীমূত বাহনের কথা শুনলাম। ভদ্রলোক নাকি প্রথম জীবনে একজন নাম করা প্রাণীতত্ত্ববিদ হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

তারপর সরকারের সঙ্গে কোন ব্যাপারে প্রচণ্ড মতবিরোধ হয়। সরকারের তরফ থেকে ওঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এরপর দীর্ঘদিন ওঁর কোন হদিস পাওয়া যায় নি। গত কয়েক বছর হল এই গোপাল পুরের কাছাকাছি এক নির্জন জায়গায় উনি একটা অ্যাসাইলাম খুলেছেন।

অ্যাসাইলাম, অর্থাৎ পাগলা গারদ। কিন্তু প্রাণীতত্ত্ববিদ থেকে কেউ পাগলের ডাক্তার হয়েছে বলে তো আজ পর্যন্ত শুনি নি।—আমি না বলে পারি না।

এটা আরো অনেকেই মনে করে। কিন্তু ডাক্তার জীমূত বাহনের যোগ্যতা সম্পর্কে এ যাবৎ কেউ প্রশ্ন তুলতে সাহস পায়নি। প্রচণ্ড বুদ্ধিমান এবং ধী-শক্তি সম্পন্ন মানুষ উনি!—হিমাংশু বলে।

ওঁর অ্যাসাইলামে রুগীর সংখ্যা কত? —আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সেটাই তো ভারি আশ্চর্য। কয়েকটা অজ্ঞাত কুলশীল হাবাগোবা পাগল ছাড়া কোন জানা শোনা কাউকে সেখানে ভর্তি হতে দেখা যায় নি। এমন কি ওখানকার ডাক্তার বলতেও আর কেউ আছে বলে জানা যায় নি।

ভারি অদ্ভুত তো! বিষয়টি সম্পর্কে আমার কৌতূহল উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল।

কোনদিন কিছু প্রমানিত না হলেও অনেকেরই ধারণা, ওই অ্যাসাইলাম চালানো নাকি ডাক্তারের আসল কাজ নয়। ওর আড়ালে অন্য কোন গভীর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে চলেছেন উনি।

—হিমাংশু বেশ রহস্যময় ভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করল।

উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে, কখনও ভেবেছিস ?

না। তার কারণ প্রথমতঃ ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। দ্বিতীয়তঃ ডাক্তার কোন অজানা লোককে তার অ্যাসাইলামের ধারেও ঘেঁষতে দেয় না।

আশ্চর্য ! —সেই মুহূর্তে এর বেশী কোন মন্তব্য যোগায় না আমার মুখে।

চার

[আমার ডাইরীর পাতা থেকে]

৪ঠা মার্চ, সকালবেলা—

ডাক্তার জীমূতবাহনের সঙ্গে আবার দেখা হল।

সত্যি বলতে কি, প্রথম দিন সন্ধ্যেবেলা সমুদ্রের ধারে ডাক্তারকে দেখে এবং হিমাংশুর মুখে তাঁর রহস্যজনক কীর্তিকলাপের কথা শোনার পর থেকেই মনটা ওই আশ্চর্য মানুষটার দিকে বারবার ছুটে যাচ্ছিল। বোধ হয় এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু হিমাংশুর কাছে ডাক্তারের জীবনকথা শোনার পর, দিন দুয়েক সন্ধ্যেবেলা সমুদ্রের ধারে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও ডাক্তার জীমূত বাহন কিংবা তাঁর অদ্ভূত সঙ্গী জ্যাকির দেখা মিলল না।

দেখা মিলল দিন তিনেক বাদে সকালবেলা গোপালপুর বাজারের মধ্যে। প্রথমদিন যখন দেখলাম, ডাক্তার জীমূতবাহন কলা ওলার কাছ থেকে কলার কাঁদি কিনছেন। সঙ্গে একটা লোক, চাকর বলেই মনে হল—কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাকে দেখেছিলাম, এ সে নয়। দূর থেকে ডাক্তারকে দেখেই আমি থমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম, ডাক্তার কলা কিনে গাড়িতে তুলছেন। বাজারের ঠিক

পাশেই ডাক্তারের একটা পুরোনোঅ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির দিকে যাবার পথে এক ছড়া কলা সঙ্গের লোকটিকে দিলেন ডাক্তার, আর অমনি লোকটা কলার খোসা ছাড়িয়ে সেগুলো গবগব করে খেতে শুরু করল। কোন মানুষকে অমনভাবে কখনও কলা খেতে আমি দেখিনি—এমনকি কোন পাগলকেও না। ডাক্তার কিন্তু গাড়িতে ওঠার আগে আমায় ঠিক দেখতে পেয়েছেন। এক ঝলক দৃষ্টি মেলে তাকালেন। এই বয়সেও কী অদ্ভুত দ্যুতিময় ওঁর চোখের দৃষ্টি। একবার মনে হল, ওদুটো চোখ আমার দিকে তাকিয়ে একবার নীরবে হেসে উঠল। ব্যাস, ওইটুকুই! অ্যাম্বাসাডার হুস করে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে।

৭ই মার্চ : দুপুর তিনটে—

সুযোগটা যে এমন অভাবিত ভাবে আসবে, আগে ধারণা করতে পারিনি। ডাক্তার আমায় তাঁর অ্যাসাইলামে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ডাক্তার জীমূতবাহনের সঙ্গে কথা হয়েছে আজই সকালবেলা। প্রায়ই বাজারে আসাটা ডাক্তারের বোধহয় এক ধরনের অভ্যাস। কে জানে, অ্যাসাইলামের পুরো বাজারটাই উনি একা সারেন কিনা—নাহলে রোজ এত কাঁচা বাজার একসঙ্গে করতে হয় কেন'

পরপর দুদিন দেখলাম, ডাক্তার গাড়ি নিয়ে গোপালপুর বাজারে এসেছেন। সঙ্গে সেইঅদ্ভুত চাকরটা! ওর চালচলন, কলা খাওয়ার ভঙ্গি দেখে প্রথম দিনই আশ্চর্য হয়ে ছিলাম। গতকাল ডাক্তারকে ওর নাম ধরে ডাকতে শুনলাম। অদ্ভুত নাম—শিম্পু! লোকটাকে ত এদেশীয় মনে হয়, সমুদ্রের ধারের সেই চাকরটার মতই—তবে ওদের এমন সৃষ্টিছাড়া নাম কেন?

পরিচয় হল আজই সকালে। আজও সঙ্গে অন্যদিনের মত সেই অদ্ভুত চাকর শিম্পু ছিল।

বাজার শেষ করে শিম্পুকে প্রথমে গাড়িতে তুলে দিয়ে উনি উঠতে গিয়েও আজ থমকে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ডাক্তার। সাদা গোঁফ দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে থেকে যেন একরাশ মুক্তো ঝকমক করে উঠল। আমায় হাত নেড়ে ইশারায় কাছে ডাকলেন। বেশ অবাক হয়েই এগিয়ে গেলাম। উনি আমার কাঁধে হাতটা রাখতেই গাটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল। কোন সম্মোহনী শক্তি আছে নাকি মানুষটার মধ্যে ?

জিজ্ঞেস করলেন, নাম কি ?

নিজের নাম বললাম।

কোথায় থাকা হয় ?

থাকি কোলকাতায় এবং এখানে যে কয়েক দিনের জন্যে বন্ধুর হোটেলে বেড়াতে এসেছি তাও বললাম।

ডাক্তার জীমূতবাহন হাসলেন। আবার সেই ঝকমকে মুক্তোর মেলা।

আমার সম্পর্কে খুব কৌতুহল, তাই না ?

শুনে অবাক হলাম। মানুষটা হাত গুনতেও জানে নাকি ?

আসুন না, আজ সন্ধ্যেবেলা আমার অ্যাসাইলামে।

আপনার অ্যাসাইলামে! আমায় যেতে বলছেন ? কথাটা বিস্ময়ের ঘোরে আচমকাই বেরিয়ে গেল মুখ থেকে।

বুঝতে পেরেছি, এর মধ্যেই কেউ মাথার মধ্যে আমার সম্পর্কে অনেক আজগুবি কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে, ডাক্তার জীমূতবাহন আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—আজেবাজে লোককে সত্যিই আমি আমার অ্যাসাইলামে ঢুকতে দিয়ে শান্তি নষ্ট করিনা। কিন্তু আমি মানুষ চিনি। —আবার সেই আশ্চর্য হাসিটা হেসে বললেন, আজ সন্ধ্যেবেলা আপনার অপেক্ষাতেই থাকব।

বেশ, যাব।—অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধের মত কথাটা উচ্চারণ করি।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেবার মুখে আর একবার আমার দিকে

তাকালেন ডাঃ জীমূতবাহন। ইশারায় আরো কাছে ডেকে চুপি চুপি বললেন, ব্যাপারটা কিন্তু গোপন রাখবেন। আমাদের দুজনের স্বার্থে, কেমন ?

একইভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়লাম।

গাড়িটা ধোঁয়া ছেড়ে হুস করে চলে গেল।

এখন দুপুর তিনটে বেজে গেছে, আর কিছুক্ষনের মধ্যেই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

কি এমন রহস্য আছে ওই অ্যাসাইলামে, কোন বিচিত্র জগতের বাসিন্দা উনি তা আমায় আবিষ্কার করতেই হবে। হিমাংশুকে বললে ও নিশ্চয়ই আমাকে যেতে দেবে না। কিন্তু ডাক্তার জীমূতবাহনকে কথা দিয়েছি। আর, নিজেকে রক্ষা করার মত আত্মবিশ্বাস আমার আছে।

অতএব যাব—যেতে আমায় হবেই !

পাঁচ

(কৌতূহল বাধাহীন)

হোটেল "সাগর দর্শন" থেকে ডাক্তার জীমুতবাহনের অ্যাসাইলাম বেশ কিছুটা পথ। পথের নির্দেশ জানাই ছিল—বাজার থেকে সোজা নাক বরাবর রাস্তা চলতে বিশেষ কষ্ট হল না। পথেই সন্ধ্যে গড়িয়ে এল। অ্যাসাইলামের কাছাকাছি এসে যখন পৌঁছিলাম, চারদিকটা অদ্ভুত নিরিবিলি হয়ে গেছে। একেই জায়গাটায় লোকবসতি খুবই কম, স্থানীয় লোকজন বলতে কিছু জেলে এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, তার উপর এদিকটা কেউ বড় একটা আসে না। বেশ জংলা জংলা ভাব।

কিছু দূর থেকেই ডাক্তারের অ্যাসাইলাম দেখতে পেলাম, একতলা ধূসর রঙের বাড়িটা, অনেকখানি জায়গার ওপর। ভেতরে বেশ কয়েকটা ঘর আছে মনে হল। সামনে বাগান, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

বাগানের সামনে লোহার গেট। ডাক্তার জীমূতবাহন বোধ হয় আমার অপেক্ষাতেই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই ঝকমকে দাঁত বের করে হেসে বৃদ্ধ আমায় আপ্যায়ন করলেন,—আসুন অনিমেষবাবু, জানতাম আপনাকে এখানে আসতেই হবে।

কথাটা ঝট করে কানে বাজল। কিন্তু উনি ততক্ষণে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে গেছেন। অগত্যা আমিও অনুসরণ করলাম। বাগানটাতে খুব চেনা জানা কয়েকটা মৌসুমী ফুলের গাছ ছাড়া আর কিছু পেলাম না। একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে পাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, খালি গায়ে খাঁকি হাফ-প্যাণ্ট পরা একটা লোক ফুল গাছে জল দিচ্ছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ও নাক দিয়ে জন্তুর মত অমন ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে কেন? মুখ ফেরাতেই ডাক্তারের সঙ্গে চোখাচোখি হল। বললেন, ও আমার খুব বিশ্বস্ত চাকর হেগি। ওর কাজ—অ্যাসাইলামের বাগান তদারক করা।

ভারি অদ্ভুত নাম আপনার লোকগুলোর! —কথাটা না বলে আর পারলাম না।

ডাক্তার আমার কথাটা প্রায় এড়িয়ে গিয়েই বললেন, চলুন, আগে বরং বসে একটু চা-টা খেয়ে নেওয়া যাক।

কিন্তু এখানে জমিয়ে বসে চা খেতে আমি আসিনি। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ডাক্তার জীমূতবাহনের মূল রহস্য উদ্ধার করা এবং সেই সঙ্গে ওই সব আশ্চর্য নামের লোকগুলোর ব্যাপারটাও জানা। তাই মুখে বললাম, চায়ের জন্য ব্যস্ত হবেন না। হোটেল থেকে চা-টা খেয়েই আমি বেরিয়েছি। বরং সব দেখা শোনা হয়ে যাবার পর······

বুঝেছি—, আরও কি বলতে গিয়েও হঠাৎ থমকে গেলেন ডাক্তার জীমূতবাহন, তারপর আমার চোখের উপর নিজের সমুদ্র গভীর চোখ দুটো রেখে বললেন, আজ আপনার এখানে আসার কথা অন্য কেউ জানে?

না। —কথাটা উচ্চারণ করলাম বেশ অস্বস্তি ভরেই, কারণ ডাক্তার তখনও নিজের চোখ দুটির সাহায্যে আমাকে যেন জরীপ করে চলেছেন।

প্রায় এক মিনিটকাল ওইভাবেই আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর হেসে উঠলেন উনি। গোঁফ দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে থেকে ওঁর সাদা দাঁতগুলো ঝকমক করে উঠল। বললেন, আমি জানতাম। লোক চিনতে আমি ভুল করি না।

ছয়

[রহস্য গভীর গোপন]

কথা হচ্ছিল ডাক্তার জীমূতবাহনের ল্যাবরেটরি ঘরের ভেতর বসে। একগাল হেসে ডাক্তার বললেন, অনিমেষ বাবু, আমার অ্যাসাইলাম ঘুরে আপনি মোটেই সন্তুষ্ট হননি বুঝতে পেরেছি, তবে ডাক্তার জীমূত বাহনের প্রকৃত ক্ষমতার পরিচয় ওখানে নেই।

একটু আগেই এই ল্যাবরেটরি ঘরে বসেই চা-পর্ব শেষ করেছি। ডাক্তার জীমূতবাহনের সঙ্গে গোপালপুর বাজারে দেখা সেই অদ্ভুত মানুষ শিম্পু এসে দিয়ে গেছে চা আর সাবুর পাঁপর! তারও আগে অ্যাসাইলামটা ঘুরে দেখিয়েছেন ডাক্তার। সত্যি বলতে কি, দেখে হতাশই হয়েছি। জন কয়েক মাত্র রুগী। প্রত্যেকটা পাগলকে দেখেই মনে হল, দরিদ্র, ভবঘুরে শ্রেণীর মানুষ তারা এবং ওদের পাগলামী বর্ত্তমানে এমন পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে উপযুক্ত চিকিৎসা সত্ত্বেও ওরা কেউ কোনদিন নিরাময় হবে কিনা, তা রীতিমত সন্দেহের বিষয়।

অ্যাসাইলাম দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবজ্ঞাসূচক মন্তব্যটা মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছিল ঃ এই আপনার বিখ্যাত অ্যাসাইলাম!

মুহূর্ত্তেই ক্ষণিকের জন্যে ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি যেন বদলে

গিয়েছিল। তারপরই আগের মত হেসে বললেন, নারকেলের ছোবড়া চিবিয়েই কি আর নারকেলের স্বাদ বোঝা যায় অনিমেষ বাবু? এবার আমার আসল গবেষণাগারে আপনাকে নিয়ে যাব।

আসল গবেষণাগার! একটু বিস্মিত হয়েই ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

আমি একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ, কেউ বলেনি আপনাকে?

—একটা রহস্যময় হাসি ছুঁড়ে দিয়ে ডাঃ জীমূতবাহন অন্দরের বন্ধ দরজার কলিং বেলটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন।

দরজা খুলে দেয় বেঁটে, পাকানো চেহারার একজন লোক, লোকটার গায়ের রং হলদেটে সম্ভবত কোন পাহাড়ী এলাকার অধিবাসী। চোখদুটো হিংস্র শ্বাপদের মত। শরীরে যথেষ্ট শক্তি রাখে দেখলেই বোঝা যায়।

উল, ইনি আমাদের অতিথি। শিম্পুকে বল ল্যাবরেটরি ঘরে আমাদের দুজনকে চা, পাঁপর ভাজা দিয়ে যেতে আর তুমি কাছাকাছি থেকো—দরকার হলে ডাকব।

এবার ডাক্তারের সঙ্গে ওঁর ল্যাবরেটরির দিকে এগিয়ে চললাম। কী পরিষ্কার ঝকঝক করছে চারপাশটা, এতটুকু ধুলো কিংবা একটা অসংগতিও কোথাও চোখে পড়ল না।

তবে অসংগতি যা দেখছি, তা হল ডাক্তারের চাকরগুলোর চেহারা চালচলন আর তাদের নামগুলো। জ্যাকি, শিম্পু, হেগি, উল—এসব নাম শুধু এদেশে কেন, অন্য কোন দেশের মানুষেরও হতে পারে বলে আমার জানা নেই।

প্রসঙ্গটা তুলব মনে করছি, হঠাৎ আমরা ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

ল্যাবরেটরি ঘরটা নিপুণ হাতে সাজান-গোছানো। নানা ধরনের উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তো আছেই, সেই সঙ্গে দেয়াল আলমারির তাকে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে নানা আকারের সব

কাঁচের জার। সেগুলোর এক একটার মধ্যে এক এক ধরনের জিনিস রয়েছে। কয়েকটার মধ্যে আছে মানুষ এবং পশু-শরীরের মধ্যেকার কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ। কলকাতার সওদাগরি অফিসের কেরানী আমি, এসব জটিল জিনিস চেনার সামর্থ আমার নেই। তবে প্রতিটি জারেই ওই সব শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো মনে হল কোন তরল কেমিক্যালের মধ্যে জিয়নো রয়েছে।

আপনি কি জানেন অনিমেষবাবু, মানুষ অন্যান্য প্রাণীর থেকে যত উন্নতই হোক, এই জীব জগতে বেশ কিছু প্রাণী আছে যাদের অনেক কিছুই মানুষ এখনও পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারেনি।

ডাক্তার জীমূত বাহনের কথায় আমার এতক্ষণে চিন্তা সূত্র ছিন্ন হ'ল। ডাক্তার বলে চলেছেন,—মানুষ কি কোনদিন পারবে কুকুরের ঘ্রান শক্তি, শিম্পাঞ্জীর শারীরিক তৎপরতা কিংবা ঈগল পাখির দৃষ্টিশক্তি অর্জন করতে?

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি ডাক্তার জীমূতবাহনের দিকে। কি বলতে চান ডাক্তার?

না, পারবে না। পেতে পারে না। এখানেই প্রকৃতি মানুষকে বঞ্চিত করে ওই সব প্রাণীদের জিতিয়ে দিয়েছেন। ডাক্তার নিজেই নিজের কথার জবাব দেন।

কিন্তু এসবের সঙ্গে আপনার গবেষনার সম্পর্ক কি?—আমি আর না জিজ্ঞেসকরে পারি না।

সম্পর্ক পুরোটাই। ডাক্তার কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে তারপর বললেন, আমার গবেষনার বিষয় বস্তু এটাই।

আমি একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই খসখস শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি, ডাক্তার জীমৃত বাহনের সেই চাকর শিম্পু ঘরে ঢুকছে। এত কাছ থেকে এই প্রথম সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকালাম। তাকিয়েই ভীষণ ভাবে চমকে উঠলাম। ও দৃষ্টি কোন মানুষের হতে পারে না। চেহারাটা অবশ্যই মানুষের মত—কিন্তু

হাঁটার ভঙ্গি, মাঝে মাঝে গা চুলকানো, দাঁত বার করা, চোখের দৃষ্টি আমায় একটা প্রাণীর কথাই মনে করিয়ে দেয়—কলকাতার আলিপুর চিড়িয়া খানায় বহুবার দেখা শিম্পাঞ্জীটা। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম ওর দিকে। ও কোনদিক দৃকপাত না করে নীরবে সামনের টেবিলটা থেকে আমাদের চায়ের কাপ ডিসগুলো তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

দৃষ্টিটা এবার ডাক্তার জীমূতবাহনের দিকে রেখে বললাম, —আপনার এই চাকরটার নাম শিম্পু, তাই না?

ডাক্তার আমার প্রশ্ন শুনে সকৌতুকে হেসে মাথা নাড়লেন।

আমি বুঝতে পেরেছি, শিম্পু আসলে শিম্পাঞ্জীর অপভ্রংশ!

সাত

[ডাক্তারের গবেষনা]

ডাক্তার জীমূতবাহন অকপটে শোনালেন তাঁর গবেষনার কথা।

বিষয়টা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি উদ্ভট!

এই জনবিরল অঞ্চলে ডাক্তারের অ্যাসাইলাম খোলার নাকি দুটো উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ, একটা পাগলা গারদ সাজিয়ে রেখে অন্যের দৃষ্টিকে তাঁর আসল অভিসন্ধি থেকে সরিয়ে দেয়া এবং দ্বিতীয়ত, ওই অ্যাসাইলামের অজ্ঞাত কুলশীল ভবঘুরে পাগলগুলোকে নিজের গবেষনার গিনিপিগ বানানো।

আমার দেখা জ্যাকি, শিম্পু, হেগি, উল এরা আকৃতিতে মানুষ হলেও আসলে কেউই পুরোপুরি মানুষ নয়।

অ্যাসাইলামের কিছু অ-নিরাময় যোগ্য সমাজ এবং সংসার পরিত্যক্ত পাগলের ওপর এক্সপেরিমেণ্ট করছেন ডাক্তার।

বিশেষ প্রক্রিয়ায় শিয়াল, শিম্পাঞ্জী কিংবা নেকড়ের ব্রেন ট্রান্সপ্লাণ্ট করেছেন ওই মানুষগুলোর অকেজো মস্তিস্কের বদলে।

এই সঙ্গে বিশেষ কিছু নার্ভসিস্টেম এবং গ্ল্যাণ্ডেও কেমিক্যাল ট্রিটমেণ্ট প্রয়োগ করেছেন। এর জন্য অবশ্যই দীর্ঘ এক্সপেরিমেণ্টের যুগ পার হতে হয়েছে ডাক্তারকে।

এই জন্যই আমি গোপাল পুরে প্রথম সন্ধ্যেবেলা জ্যাকিকে (জ্যাকল) দেখেছিলাম সমুদ্রের ধারে গর্ত থেকে জ্যান্ত কাঁকড়া বার করে খেতে কিংবা ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের মুখে দেখা ডাক্তারের চাকর উল এর (উলফ) চোখ দুটোতে হিংস্র শ্বাপদের দৃষ্টি।

কিন্তু একটা মানুষকে জান্তব প্রকৃতি দান করে কি উদ্দেশ্য সফল করতে চান আপনি ? —সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন অমানবিক আর অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছিল।

খুব শান্তভাবে হাসলেন ডাক্তার জীমূতবাহন। তারপর বললেন, মানুষ আপনি কাকে বলছেন অনিমেষবাবু ? যে লোকগুলোকে নিয়ে আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছি, সমাজ এবং পরিবারের কাছে তারা তো বহু আগেই মৃত। তাদের যদি অন্যভাবে আমি সমাজের প্রয়োজনে লাগাতে পারি, তবে সেটাই কি আরো কৃতিত্বের নয় ?

সমাজের কি প্রয়োজনে, আপনি এদের লাগাতে পারেন, —আমার কণ্ঠে যুগপৎ বিদ্রূপ এবং কৌতূহল।

আগেই তো বলেছি অনিমেষবাবু, আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে এমন অনেক কাজ আছে, যা মানুষের থেকেও কোন কোন পশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবলে অনেক বেশী দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হতে পারে। ডাক্তার বেশ স্থিরভাবেই আমার প্রশ্নের উত্তরে বলে চললেন, উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার হয়। মনে করা যাক, একটা বিশতলা বাড়িতে আগুন লেগেছে। আমাদের সদা জাগ্রত দমকলবাহিনী সর্ব শক্তি দিয়েও সে আগুন নেভাবার জন্য নানা প্রক্রিয়া এবং প্রস্তুতির মাধ্যমে যে সময় ব্যয় করবেন, তার চেয়ে অনেক কম সময়ে কয়েকজন শিম্পাঞ্জী মানুষ সে কাজ সমাধা করে ফেলবে। কারণ শিম্পাঞ্জীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও ক্ষমতাবলে সে

সাধারণ দমকল বাহিনীর সব থেকে দক্ষ কর্মীর চেয়েও অনেক দ্রুত সেই বিশতলা বাড়ির দেয়াল বেয়ে উঠে কিংবা কার্ণিশে ঝুলে গিয়ে আগুন নেভানোর জলের পাইপ যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারবে। কিংবা ধরুন, পুলিশের কোন কর্মীর যদি কুকুরের ঘ্রাণ শক্তি থাকে, তবে হত্যাকারীর ফেলে যাওয়া কোন নিদর্শনের সাহায্যে পদ্ধতিগত জটিল কলাকৌশল ছাড়াও অনেক দ্রুত অপরাধীর হদিস করে ফেলতে পারে।

আমি তাজ্জব হয়ে শুনেছিলাম ডাঃ জীমূতবাহনের আজব থিয়োরী।

হঠাৎ ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাগানের দিকের খোলা জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে বিষাদক্লিষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে বললেন. কিন্তু আমার গবেষণা একটা বিশেষ সমস্যার সামনে এসে থমকে গেছে অনিমেষবাবু এবং একমাত্র এই সমস্যা সমাধানের ওপরই নির্ভর করছে আমার গবেষণার সম্পূর্ণ সাফল্য।

আট
[প্রস্তাব]

বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলছিলাম না। আমার মনে হল, ডাক্তার জীমূতবাহন এবার একটা ভয়ঙ্কর কিছু বলার জন্যে সময় নিচ্ছেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই ডাক্তার পিছু ফিরলেন। সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এলেন। ডাক্তারের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। বৃদ্ধের দৃষ্টি বদলে গেছে—অসহ্য তীব্র সে চাউনি। টেবিলের ওপর ত্রকটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে উনি বললেন, জ্যাকি, শিম্পু, হেগি কিংবা উল আমার এক্সপেরিমেণ্ট সম্পূর্ণ সফল করতে পারেনি, কেন জানেন অনিমেষবাবু?

আমি মোহাচ্ছন্ন ভাবে শুধু ঘাড় নাড়লাম।

কারণ একটা বাতিল উন্মাদ মগজের বদলে শিয়াল, শিম্পাঞ্জী কিংবা নেকড়ের মগজ যে মানুষটার মাথার মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে একটি পশুর স্বাভাবিক প্রবণতার সবটুকু সে পেলেও মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিটুকু পায়নি। যার ফলে আমি শুধু মাত্র তৈরী করতে পেরেছি মানুষের আকারের একটা শিয়াল, শিম্পাঞ্জী কিংবা নেকড়ে। তাকে পোষ মানানো হয়ত যায়—কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আমার এই সুদীর্ঘ গবেষণা, তা সফল হয় না।

তাহলে কি করতে চান আপনি ?

আমার কথা শুনে ডাক্তার জীমূতবাহন হাসলেন। এ হাসি সম্পূর্ণ আলাদা। গাটা শিরশির করে ওঠে।

দেয়ালের ওই কোনে একেবারে শেষ জারটা লক্ষ্য করুন।

ডাক্তারের কথামত সেদিকে তাকিয়ে তেমন বৈশিষ্ট্যপুর্ণ কিছু চোখে পড়ল না।

ডাক্তার বললেন, ওর মধ্যে আছে এক উন্নত জাতের কুকুরের মগজ। সেই সঙ্গে কিছু স্নায়ুতন্ত্র।

কি এক আশঙ্কায় আমার শরীরটা হঠাৎ পাক দিতে শুরু করল।

অনেক কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন ডাক্তার। আমি তাঁর নিশ্বাস অনুভব করছি। এবার আমি যা করতে চাই তা হল, একটা সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে ওই কুকুরের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষটিকে একই সঙ্গে মানসিক বুদ্ধি বিবেচনা এবং কুকুরের ঘ্রানশক্তি সমেত তার কিছু প্রবৃত্তিগত গুণাবলী দান করে তাকে এক বিশেষ অতি ক্ষমতাসম্পান্ন কুকুর-মানব তৈরি করতে।

একটু থেমে ডাক্তার জীমুতবাহন আমার ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, এ ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থী অনিমেষবাবু।

নয়

[ফাঁদ]

একটা অস্ফুট আর্তনাদ আমার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল : না!

ডাক্তার জীমুত বাহনের ভাবভঙ্গি তখন পাল্টে গেছে। উনি হাসছেন। কারোর সুন্দর হাসিটাও যে এত তাড়াতাড়ি এমন নিষ্ঠুর আর বীভৎস হয়ে যেতে পারে, আগে আমার জানা ছিল না।

সাপের মত হিসহিস স্বরে ডাক্তার বললেন, এই জন্যই তো আপনাকে এখানে আমন্ত্রণ করে আনা অনিমেষবাবু। বুঝতে পারলাম, নিজের বুদ্ধির দোষে এই উন্মাদ ডাক্তারের মৃত্যু—ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। চেঁচিয়ে উঠে বললাম, না, আমার ওপর ওই জঘন্য পরীক্ষা চালাতে আপনি পারেন না।

ডাক্তার আবার হেসে উঠলেন। কদাকার হাসি। হেঁ-হেঁ-হেঁ— অনিমেষবাবু, মানুষের বুদ্ধি আর কুকুরের instinct এ দুয়ের অধিকারী হয়ে কী আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হতে চলেছেন আপনি ভেবে দেখেছেন? এতদিনে আমার গবেষণা হবে সার্থক!..

ছেড়ে দিন আমাকে, যেতে দিন প্রায় দৌড়ে ল্যাবরেটরি ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল।

নেকড়ে-মানুষ উল হিংস্র শ্বাপদের দৃষ্টি নিয়ে দরজা পাহাড়া দিচ্ছে। বুঝলাম আমাকে ফাঁদে আটকে রাখার সমস্ত ব্যবস্থাই ডাক্তার আগে থেকে পাকা করে রেখেছিলেন।

কিন্তু এ হতে পারে না! ওই উন্মাদ বিজ্ঞানীর হাতে কিছুতেই নিজেকে সঁপে দেবনা আমি। আমি অনিমেষ গুপ্ত। এককালের ইউনির্ভাসিটি ব্লু। কোমরের পাশ থেকে চকিতে টেনে বার করলাম নিত্যসঙ্গী ভোজালীটা। দরকার হলে আত্মরক্ষার জন্য ডাক্তারকে খুন করেও এখান থেকে পালাতে হবে।

কিন্তু ডাক্তারের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েই আবার চমকে উঠলাম। ডাক্তার জীমূতবাহনের হাতে চকচক করছে একটা রিভলবার।

আমি জানতাম, এমন একটা কিছু করার চেষ্টা আপনি করতে পারেন, তাই সব পরিস্থিতির জন্যেই তৈরি রেখেছি নিজেকে।— ডাক্তার জীমূত বাহনের মুখে সেই সুন্দর হাসিটা আবার ফিরে এসেছে। আর বোধ হয় নিজেকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই। হিমাংশুর সাবধানবানী না শোনার জন্যে বারবার অভিশাপ দিতে থাকি নিজেকে।

আপনি মিথ্যেই ভয় পাচ্ছেন অনিমেষবাবু।—ডাক্তার যেন সান্তনা দেবার ভঙ্গিতেই কথাগুলো উচ্চারণ করেন—আপনি কল্পনাও করতে পারছেন না কী অসাধারণ বাড়তি ক্ষমতার অধিকারী হবেন আপনি। একাধারে মানুষের বুদ্ধি এবং পশুর ঘ্রাণশক্তি—যা আজ পর্যন্ত কোন মানুষ অর্জন করতে পারেনি।

আমার চারপাশে বৃত্ত ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে। ডাক্তার জীমূতবাহন নিজে এবং আশপাশ থেকে জ্যাকি, শিম্পু, হেগি, উলের মত পশু-মানুষেরা জান্তবপদক্ষেপে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ঠিক এই সময়েই শোনা গেল। বাইরে থেকে বহুকণ্ঠের উত্তাল চেঁচামেচি আর হিমাংশুর চিৎকার—অনিমেষ... অনিমেষ…।

তড়িৎ গতিতে লাফিয়ে লাবরেটোরির খোলা জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ডাক্তার। অ্যাসাইলামের সামনের বাগানের গেটটা এখান থেকে দেখা যায়। হাতে হ্যারিকেন, টর্চ আর মশাল জ্বেলে বাইরের অন্ধকারকে তাড়িয়ে অ্যাসাইলামের গেট খুলে ঢুকছে কিছু লোক। তাদের বেশীর ভাগই কুচকুচে কালো স্থানীয় জেলে এবং আদিবাসী। ওদের অনেকের হাতেই টাঙ্গি কিংবা লাঠি। দলটার সামনে আমার বন্ধু হিমাংশু।

বিশ্বাসঘাতক!—দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলেন ডাক্তার জীমূতবাহন। শুভ্র শ্মশ্রু মণ্ডিত ওই ঋষিতুল্য মুখটা প্রচণ্ড ক্রোধ

আর হতাশায় ভয়ানক দেখাচ্ছে। বিশ্বাসঘাতক কে ডাক্তার? আমি না আপনি? খুব শান্ত ভাবেই কথাটা ছুঁড়ে দিই। আর আমার ভয় নেই!

দশ

[বন্ধুর সদুপদেশ]

অবশেষে হিমাংশুর জন্যেই রক্ষা পেলাম। ঘটনার দিন সকাল থেকেই আমার উন্মনা ভাব দেখে ওর নাকি সন্দেহ হয়েছিল। তারপর বিকেল থেকে হোটেলে না দেখতে পেয়ে সন্দেহ আরও তীব্র হয়। হিমাংশু আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমার প্রকৃতি ওর ভাল ভাবেই জানা। এর ওপর হোটেলের চাকর দিবাকর এসে হিমাংশুকে খবর দেয়, আমায় নাকি ডাক্তার-জীমূতবাহনের অ্যাসাইলামের দিকে সে একা একা হেঁটে যেতে দেখেছে।

শুনে আর দেরী করেনি হিমাংশু। দিবাকরের সাহায্যে স্থানীয় কিছু জেলে আর আদিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে অ্যাসাইলামে চড়াও হয়ে আমাকে উদ্ধার করে।

হিমাংশুকে সদলবলে দেখে ডাক্তার-জীমূতবাহন কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে নিজের ভোল পাল্টে ফেলে ছিলেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন হিমাংশুর সামনে। তারপর সাদা গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলের ভেতর থেকে সাদা ঝকমকে দাঁত গুলো প্রকাশ করে মোলায়েম হেসে বলেছিলেন, আপনিই বুঝি হিমাংশুবাবু, অনিমেষ-বাবুর বন্ধু? বেশ, বেশ! অনিমেষ বাবুর আগ্রহ দেখে আমিই ওঁকে আমার এখানে আমন্ত্রণ করে এনেছিলাম—আমার অ্যাসাই-লামটা ঘুরিয়ে দেখাব বলে। অবশ্য কয়েকটা বদ্ধ পাগল ছাড়া এখানে দেখবার কিই বা আছে? কিন্তু আপনারা যে মাঝ থেকে এত ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, ভাবিনি।

আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে ছিলাম মানুষটার দিকে। ওঁর মুখে আবার সেই ঝকমকে নিস্পাপ হাসি।

আমি কিছু বলতে যাবার আগেই হিমাংশু আমার হাতটা টেনে ধরেছে : এখানে কোন কথা নয়, আগে হোটেলে চ'!

সমস্ত ঘটনাটা নিঃশব্দে শুনে গেল হিমাংশু।

কোন কিছু আমি বাদ দিইনি। ডাক্তার-জীমূতবাহনের সঙ্গে আলাপ থেকে শুরু করে তাঁর শেষ আচরণ টুকু পর্যন্ত এক নিশ্বাসে বলে গেছি।

সব শুনে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল হিমাংশু। হোটেলের জানলা দিয়ে গোপালপুরের সমুদ্রতট দেখা যাচ্ছে। কালো অন্ধকার আকাশ-মাটি সমুদ্র একাকার করে দিয়েছে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হিমাংশু বলল, আমার কথা যদি শুনিস, তাহলে বলি, সব ব্যাপারটা চেপে যা অনিমেষ।

কি বলছিস তুই!—হিমাংশুর কথায় বিস্মিত না হয়ে পারি না।

কিন্তু হিমাংশু আমায় আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলল, এঘটনা অন্য কেউ বিশ্বাস করবে ভেবেছিস? আমি এক বছরেই বুঝেছি, ডাঃ-জীমূতবাহন অসাধারন ধুরন্ধর—নইলে অতসব কাণ্ডের পরেও আমাকে দেখে কি অদ্ভুতভাবে পরিস্থিতির সামাল দিল, দেখলি না? পুলিশের কাছে গিয়ে বলতে গেলে বরং তুইই অপদস্থ হবি! তারচেয়ে বরং —

চেপে যাওয়াই ভাল!—হিমাংশুর শেষ কথাটা আমি নিজেই দাঁতেদাঁত চেপে উচ্চারণ করি।

কিন্তু আমার এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতাটা? ডাক্তার-জীমূতবাহনের সেই বিচিত্র জগৎের কথা। হোক না অবিশ্বাস্য, আজগুবি—তা কি কোন কাজেই লাগবে না?

অন্তত একটা কল্প—বিজ্ঞানের গল্পও তো ফাঁদা যেতে পারে?

কেউ বিশ্বাস করুন ছাই নাই করুন!!



নৈশা

ক্যাঁ-চ—!

বিশ্রী আওয়াজ তুলে ভেতর থেকে দরজাটা খুলে গেল। সামনে যে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে প্রথমটা চমকে উঠেছিলাম। মানুষের চেহারা এত বীভৎস হতে পারে? ভূত আমি বিশ্বাস করি না—কিন্তু যদি করতাম তাহলে নিশ্চয় এই জনপ্রাণীহীন আধপোড়া বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে অন্য কিছু ভাবতে পারতাম না। কাঠির মতো রোগা শরীর, যেন হাড়ের ওপর একটা পাতলা চামড়া জড়ান, কোটরাগত চোখদুটো মৃত মানুষের মতো ফ্যাকাশে, নীচের ঠোঁটটা সামনে ঝুলে পড়া, গায়ের রং কালো, পরনে শুধু একটা আট হাতি কাপড় ছাড়া কিছুই নেই। ওই চেহারা দেখে বয়স কত তাও জানা যায় না। নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে এক হাতে লণ্ঠন, অন্য হাতে দরজার একটা পাল্লা ধরে ও দাঁড়িয়ে আছে।

গলাটা ঝেড়ে বললাম—আজকে রাতের মতো একটু জায়গা হবে? মানে গাড়ীটা পথে খারাপ হয়ে গেছে। আশপাশেও তো কোন জনবসতি দেখতে পাচ্ছি না।

ভেতরে আসুন। ওর গলার স্বরও কেমন যেন ফ্যাস ফ্যাসে। কিন্তু আমার তখন আর অন্য কিছু ভাবার সময় কোথা? এই অবস্থায় আমার সব থেকে বেশী যেটা দরকার তা হোল কয়েক ঘণ্টা টানা বিশ্রাম। লোকটার পিছু পিছু ঢুকে পড়লাম বাড়ীর ভিতরে। বাড়ীটা যে বহুদিনের পুরানো তা সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও বাইরে থেকে বুঝতে অসুবিধে হয়নি। এখন গেট পেরুতেই চোখে পড়লো বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে একটা বাগান। মানে কিছুদিন আগেও হয়তো সুন্দর বাগান ছিল—এখন সেটা গাছ-গাছালি আর ঝোপঝাড়ের জংলা জায়গা বলাই ঠিক। আমি নিঃশব্দে লোকটাকে অনুসরণ করে চলেছি। আর লণ্ঠনটা এক হাতে দোলাতে দোলাতে ঠিক যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে লোকটা। শরীরটা ওর অমন হলে কি হবে, চালচলন অত্যন্ত ক্ষিপ্র। আমার শরীরের ভেতরটা একবার শির শির করে উঠলো।

গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটা গন্ধ নাকে ভেসে এল। তীব্র, বুনো এক ধরনের গন্ধ। অচেনা কিন্তু কেমন যেন নেশা ধরা। লোকটার পিছু পিছু বাগান পেরিয়ে সামনের ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে চললাম। ওখানে বাগানের মধ্যে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে একটা একতলা বাড়ী। সামনের দিকে পাশাপাশি দুটো ঘর দেখা যাচ্ছে পেছনে আরও আছে কিনা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

নিজের ওপরই বিরক্তি জাগল। মোটরে দীর্ঘপথ পাড়ি দেবার মতলব করার আগে গাড়ীটা আরও ভালভাবে 'চেক' করার দরকার ছিল। তাহলে পথের মাঝে এই জনমানবহীন জঙ্গুলে জায়গায় সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার মুখে অকস্মাৎ টায়ার ফেটে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হোত না। আসলে বহুদিন বাদে হঠাৎ বন্ধুর আমন্ত্রণ পেয়ে দেরী করতে আর তর সয়নি এবং দুর্ভাগ্য যখন আসে বোধহয় এমনি ভাবেই স্থান-কালের হিসেব থাকে না।

তবে এত সহজে দুর্ভাগ্যকে মেনে নেওয়া আমার ধাতে নেই। নিকটবর্তী করিমপুর ছাড়িয়ে প্রায় দশ কিলোমিটার এসে এই জায়গাটায় হঠাৎ যখন গাড়ি বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলুম ঠিকই তারপর দূর থেকে এই আধা পোড়ো বাড়িটা আবিষ্কার করতে বেশী বেগ পেতে হয়নি। ভেবে দেখেছিলাম খোলা রাস্তায় গাড়িতে বসে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার কিংবা অন্য কোন অজানা বিপদের সম্মুখিন হওয়ার চেয়ে ওই পোড়ো বাড়ীতে ঢুকে রাতটা কাটিয়ে দেওয়াই কম বিপজ্জনক। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এমন জনবসতিহীন অঞ্চলে এই পরিত্যক্ত পোড়ো বাড়ীতে কোন মানুষ বাস করতে পারে এমন ধারণা আমার হয়নি।

লোকটা আমায় নিয়ে একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল। দরজা ভেতর থেকে ভেজান। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। লণ্ঠন নিয়ে লোকটা ঘরের ভেতরে ঢুকতেই সারা ঘরটা দৃশ্যমান হোল। বেশ বড়সড় ঘর। বাগানের দিকে দুটো জানালা। পুরানো আমলের একটা দেয়াল আলমারী, র‍্যাক সেগুলোতে বই ঠাসা। সেই সঙ্গে আরও কিছু দ্রব্য সামগ্রী, ঘরের জানালার ধার ঘেঁষে একটা সেকেলে খাট, অন্যধারে টেবিল, খান তিনেক চেয়ার। ঘরের আসবাব পত্তর কিংবা সাজসরঞ্জাম যেন ঠিক এই জনমানবহীন অঞ্চলের পোড়ো বাড়ীর সঙ্গে কেমন বে-মানান।

ঘরের দোর গোড়ায় আমায় থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা এক ঘেয়ে ফ্যাসফ্যাসে গলায় ডাকলো—কই, ভেতরে আসুন।

ঘরের ভেতর পা দিলাম। হ্যারিকেনটা টেবিলের ওপর রেখে লোকটা এতক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। দাঁতের পাটিদুটো উঁচু, এর ওপর চোয়াড়ে ভাঙা মুখ—তাই হাঁসতেই বীভৎসভাবে সমস্ত দাঁতগুলো ঠেলে বেরিয়ে পড়লো। আমার দৃষ্টিটা সরিয়ে নিলাম।

হঠাৎ সে বললো—এ বাড়ীতে আমি একাই থাকি। এ বাড়ীর কেয়ার টেকার।

আমি তখন. হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় ঘরের মধ্যেটা চোখ বুলোচ্ছিলাম। এবার লোকটার চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করে বললাম—তোমার নাম কি?

—জগদানন্দ। একই কণ্ঠস্বরে জবাব এল।

আমি ততক্ষণে র‍্যাক থেকে একটা বই নামিয়ে হ্যারিকেনের আলোর সামনে নিয়ে এসেছি। বইএর মলাটটা উল্টে পাতার দিকে চোখ রেখে বললাম—ডঃ আর, শ্রীনিবাসন কার নাম?

—কেন বাবুমশাই? কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে কেয়ারটেকার জগদানন্দের কণ্ঠস্বরটা কেঁপে গেল না?

—এই বইতে নাম দেখছি। র‍্যাকের আরও দু'একটা বইতে দেখলাম।

—ওঃ, এবার বেশ নিশ্চিত হয়েই সে জবাব দেয়—উনিই তো এ বাড়ীর মালিক। নামকরা বৈজ্ঞানিক।

—হ্যাঁ, নামটা যেন কোথায় দেখেছি। ডঃ আর শ্রীনিবাসন। সংবাদপত্রে কি? তা উনি গেলেন কোথায়—প্রশ্ন করি।

—যাবার সময় বললেন কোথায় যেন মিটিং এ যেতে হবে। তা প্রায় মাসখানেক আগে। তারপর আর ফেরেননি। জগদানন্দ বেশ সহজ ভাবেই জবাব দেয়।

হতেও পারে। ভাবলাম আমি। ডাক্তার, বিজ্ঞানীদের কনফারেন্স কিংবা মিটিং এ যোগদান করা আশ্চর্য্য তো কিছু নয়। ভাবনাটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করি। এ জায়গাটা এত নোংরা কেন? দেখে মনে হয় এ বাড়ীতে যেন কতকাল মানুষের পা পড়েনি। এমনকি, ঘরের মধ্যেও এখানে সেখানে ধুলোর পলেস্তারা পড়ে আছে। সবটাই ভৌতিক নয় তো?

জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, এমন সময় জগদানন্দ বললো—

আজ রাতটা এ ঘরেই কাটিয়ে দিতে পারেন। ভয় করবে না তো?

—ভয়! কেন? আমি জগদানন্দের মুখের দিকে তাকাই।

—মানে অচেনা জায়গা......আমি অবশ্য থাকবো পাশের ঘরেই।

—আচ্ছা জগদানন্দ—? ওর কথা শেষ হবার আগেই আমি বলি।

—বলুন।

—এই বাড়ীতে সত্যিই তুমি একা থাক? সম্পূর্ণ একা?

—হ্যাঁ, থাকি একাই···তবে কিনা...কি যেন বলতে গিয়েও থমকে যায় জগদানন্দ।

—তবে কিনা···কি? বল? ওর চোখে চোখ রেখে আমি জেরা করার চেষ্টা করি। লোকটা কে প্রথম থেকেই আমার কেমন যেন বেখাপ্পা, রহস্যজনক মনে হয়েছে।

—আপনি বসুন, আমি বরং আপনার জন্যে খাবার বন্দোবস্ত করি... জগদানন্দ বোধহয় আমার প্রশ্নটাকে চাপা দিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

—না. না. কোন দরকার নেই—আমি বাধা দিই—সঙ্গে আমার টিফিন কেরিয়ারে টোষ্ট, ডিম, মিষ্টি যথেষ্টই আছে। গাড়ীতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার কথা ভেবেই নিয়ে এসেছিলুম। তুমি বরং আমার দু'একটা কথার জবাব দাও।

—আপনার সব কথার জবাব দেব, বাবু। কিন্তু আজ রাতে আপনি আমার অতিথি, কিছু তো খাওয়াতেই হবে। আপনি একটু বসুন, আমি বরং এক গ্লাস সরবৎ করে আনি।

—সরবৎ! এত রাত্রে। আমি অবাক হই।

—হ্যাঁ সরবৎ। জগদানন্দ একটু থেমে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললো ডঃ শ্রীনিবাসনের নিজস্ব ফরমূলায় তৈরী। দারুণ সুস্বাদু। ভয় নেই,

বিষ খাওয়াব না বলতে বলতে প্রায় ক্ষিপ্রপদেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

লোকটা ভারি অদ্ভুত তো! হঠাৎ সরবৎ খাওয়াবার জন্মে এত জেদাজেদি করছে কেন? নানা রকম চিন্তা মাথায় আসে। সরবতের নামে বিষ খাওয়ানই কি ওর আসল উদ্দেশ্য? কিন্তু এজন্যে সরবতের প্রয়োজন কি? আমি একা, সম্পূর্ণ অসহায় এই আধপোড়ো বাড়ীটাতে ওর হাতের মুঠোর মধ্যে-ও তো যে কোন উপায়েই আমায় খুন করতে পারে। হঠাৎ মনে হোল জগদানন্দকে এত খারাপ মানুষই বা ভাবছি কেন? চেহারাটা সকলেরই কন্দর্পকান্তি হয় না—তারা সবাই কি চোর, ডাকাত, বদমাস বরং এমনও তো হতে পারে আসলে ও সত্যিই ভাল, অতিথি বৎসল। এ জঙ্গলে একা বাড়ী পাহারা দেয়। হঠাৎ একজন সঙ্গী পেয়ে খুশী হয়েছে। তাই যে কোন ভাবে অতিথি সৎকার করতে চাইছে। এখন ও সরবৎ আনতে গেছে। ডঃ শ্রীনিবাসনের নিজস্ব কোন ফরমূলায় বানান···চিন্তা করতেই হঠাৎ মনে পড়লো ডঃ আর শ্রীনিবাসনের কথা। বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী।

তাহলে কি এই জঙ্গুলে জায়গায় এই পোড়ো বাড়ীটাই তার—গবেষনাগার? উদ্ভিদ বিজ্ঞানী বনে জঙ্গলে নিভৃতে গাছগাছড়া নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবেন—এতে আর আশ্চর্য কি!

ভাবতেই সমস্ত ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হয়ে গেল। হঠাৎ যেন বেশ কিছুটা স্বস্তি অনুভব করি।

জগদানন্দ ঘরে ঢুকলো। হাতে একটা চাউস কাঁচের গ্লাসে ভর্তি সবুজ রঙের সরবৎ, আর একটা প্লেটে কিছু কুচো ফল পাকড়।

—এই সরবৎ যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনি সুস্বাদু। একবার খেলে আর এক গ্লাস খেতে ইচ্ছে করবে। জগদানন্দ বিশ্রীভাবে ওর দাঁতের পাটিদুটো বার করে নিঃশব্দে হাসলো।

—কিন্তু সঙ্গে আবার ফলের কুচি কেন ?

—এই বন বাদারে আপনাকে আর কি খাওয়াতে পারি বলুন। জগদানন্দ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বিনয়ী হতে চাইলো।

একটু আগে যদিও অনেককিছু ভেবেছি' এমনকি-জগদানন্দ লোকটা ভাল হতে পারে এমন সার্টিফিকেটও মনে মনে দিয়ে দিয়েছি, তবু সরবৎ হাতে নিয়ে মনটা যেন কেমন করে উঠলো। ওর মুখের দিকে তাকালাম। ভাবলেশহীন। সত্যিই কোন মতলব নেই তো লোকটার? হঠাৎ মাথায় বুদ্ধির একটা চমক খেলে গেল। জগদানন্দকে বললাম—ফল আমার দরকার নেই, বরং এস সরবৎটা দুজনে ভাগ করে খাই। তুমি ওই প্লেটে কিছুটা ঢেলে খেয়ে নাও। এত ভাল স্বাদ যখন তুমিই-বা বাদ যাবে কেন ?

নিঃশব্দে হাসলো জগদানন্দ। ওকি আমার চালাকি টের পেয়েছে? কিছু না বলে গ্লাস থেকে প্লেটে কিছুটা সরবৎ ঢেলে এক চুমুকে পান করলো। তারপর প্লেটটা ঠিক করে টেবিলের ওপর রেখে বললো—এবার তো বাবু মশায়ের আপত্তি হবে না ?

ভীষণ লজ্জায় পড়লাম। এভাবে ঠকে যাব ভাবিনি। এবার আর দ্বিধা না করে গ্লাসের অবশিষ্ট সমস্ত সরবৎটাই এক নিঃশ্বাসে পান করলাম।

সত্যিই অপূর্ব স্বাদ। এত মিষ্টি অথচ চমৎকার আমেজধরা সরবৎ জীবনে কখনও পান করিনি আমি। তবে বাড়ীতে ঢুকতেই যে বুনো নেশা ধরা গন্ধটা নাকে লেগেছিল এই সরবতে সেটা আরও তীব্রভাবে পেলাম। কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। মাথার মধ্যেটা কেমন যেন একটা হালকা ঝিমুনি বোধ করছি। অনেকটা দুর্গাপুজোর বিজয়ার রাতে সিদ্ধির নেশার মতো—কিংবা তাও নয়, অন্য ধরণের। ঠিক ভাবতে পারছি না—তবে কি সরবতের মধ্যে মাদক জাতীয় কিছু মেশান ছিল ?

জগদানন্দ আমার দিকে তার বিশ্রী ক্ষয়া দাঁতের পংক্তিগুলো

বার করে তাকিয়ে ছিল। ব'লো—আপনি কি যেন আমায় জিজ্ঞেস করবেন বলছিলেন।

লোকটা কি আমার অবস্থা বুঝতে পারছে না? নাকি জেনে বুঝেই পরীক্ষা করতে চাইছে তার সরবতের প্রতিক্রিয়া আমার ওপর কেমন হলো সেটা পরখ করতে।এদিকে ঝিমুনিটা আমার ক্রমেই বাড়ছে—কিন্তু সেই সঙ্গে সরবতের মিষ্টি স্বাদটাও জিভে জড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে আর এক গ্লাস চেয়ে খাই।

বুঝতে পারলাম একটা নেশাড়ে লোকের মতই নিজের ওপর ক্রমেই আস্থা হারাতে শুরু করেছি। একটা ঘুম ঘুম ভাব দুচোখের পাতায় ভর করেছে। আমি নিশ্চিন্ত—এসবই সেই সরবতের ক্রিয়া। কিন্তু এভাবে আমাকে নেশাচ্ছন্ন করে ওর লাভ কি? প্রাণে না মেরে সর্বস্ব অপহরণ? কিন্তু কাল সকালে যখন আমার নেশা কেটে যাবে—তখন ওকে বাঁচাবে কে? নাঃ ,কিছু চিন্তা করতে পারছি না।

হঠাৎ বড্ড গরম হতে শুরু করছে। কুলকুল করে ঘামছি। ঘরের দুটো জানালা। একটা খোলা। অন্য যেটা বাগানের দিকে—বন্ধ। সেদিকে এগিয়ে গেলাম। জানলাটাটেনে খুলতে যাব—হঠাৎ জগদানন্দ লাফিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল—বাবুমশাই, ওই জানলাটা খোলা যায় না। বাইরে থেকে বন্ধ।

—কিন্তু কেন? আমার গরম হচ্ছে। ওদিকে তো বাগান। জানলাটা খুলতে অসুবিধে কি? আমার কণ্ঠের বিস্ময় চাপা থাকে না।

—সব অসুবিধে সবাইকে বলা যায় না বাবুমশাই—বিশেষতঃ সে যদি এ বাড়ীর রাতের অতিথি হয়—

চমকে তাকিয়ে দেখলাম জগদানন্দের চোখের ভাষা কেমন যেন বদলাতে শুরু করেছে। অল্প আলোতে ও দীপ্ত হয়ে উঠেছে ওর চোখের দৃষ্টি।

আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। মাথার মধ্যেটা ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসছে। জগদানন্দ কি সেই আশাতেই বসে আছে—যেমন ভাবে মাকড়সা বসে থাকে জালের—মধ্যিখানে জালে পড়া পতঙ্গটার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কখন সে একেবারে অবশ হয়ে পড়বে সেই আশায়।

নাঃ', এ হতে পারে না। আমি নিখিলেশ সেন। এখনও রীতিমত দেহচর্চা করি। কোমরের কটিতে এই মুহূর্তেও লুকোনো আছে আমার প্রিয় ধারাল ভোজালিটা। এত সহজে হার আমি মানব না। কিন্তু আপাততঃ কি করতে পারি আমি?

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলাম। এই ফাঁদ থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র-উপায় এই ঘরের দরজা বন্ধ করে রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে দেওয়া একবার সকাল হয়ে গেলে ওর কোন মতলবই আর খাটবে না—এ বিশ্বাসটুকু আমার আছে।

একটা হাই তুলে বললাম— জগদানন্দ, তোমার আর এখন এ ঘরে থাকার প্রয়োজন নেই। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আমি আর বসতে পারছি না।

জগদানন্দ কি খুশী হলো আমার কথা শুনে? বোঝাগেল না, কিন্তু উত্তরে কিছু না বলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ও ঘর ছেড়ে চলে যেতেই হ্যারিকেনের আলোটা আর একটু উসকে দিয়ে সারা ঘরটা আর একবার ভাল করে দেখে নিলাম। বেশ কিছুদিন অব্যবহৃত। একজন বে-হিসেবী, জ্ঞানী লোকের ঘর যেমন ভাবে থাকা উচিত তেমনিই আছে সবকিছু। সন্দেহ জনক বিশেষ কিছুই চোখে পড়লো না। —কেবল মাত্র বাগানের দিকের ওই বন্ধ জানলাটা ছাড়া। কয়েকবার চেষ্টা করেও জানলাটা খোলা গেল না। বাইরে থেকে শক্ত ভাবে আঁটা। মনে পড়লো—একটু আগে জানলা খোলার ব্যাপারে জগদানন্দের ঘোরতর আপত্তির কথা। অথচ কারণটা কি সে বলেনি।

রহস্যের জট ক্রমেই পাকিয়ে যাচ্ছে।

দূরে কোথা থেকে একটা ক্ষীন 'দুম' 'দুম' শব্দ ভেসে এল।

কোথাও যেন কেউ প্রচণ্ডভাবে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। শব্দটা এখানে আসার পর আরও কয়েকবার শুনেছি—কিন্তু নানা চিন্তার মধ্যে খেয়াল করিনি। কান পাতলাম। শব্দটা আর শোনাযাচ্ছে না। একটু বাদে আবার শোনা গেল।

বেশ কিছুক্ষণ ভাববার চেষ্টা করেও ওটা কিসের আওয়াজ বুঝতে পারলাম না। শেষে মনকে বোঝালাম, এ বাড়ীর অনেকগুলো রহস্যের মধ্যে ওঠাও একটা। পরদিন সকাল না হলে টের পাওয়া যাবে না।

কিন্তু চোখ দুটো যে আমার জুড়ে আসছে। সকালের অপেক্ষায় জেগে বসে থাকা আমার পক্ষে আদপেই সম্ভব নয়। সারা দিনের ক্লান্তি, তার ওপর সরবতের নেশা—আমার জেগে থাকার শেষ শক্তিটুকু ও যেন শুষে নিচ্ছে। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

খাটটা সেই বন্ধ জানলাটার ধারেই। একটু ইতস্তত: করেও মন থেকে আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলে খাটে উঠে শুয়ে পড়লাম। হ্যারিকেনটা টেবিলের ওপর জ্বালাই রইলো। শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তলিয়ে গেলাম ঘুমের অতলে।

* * *

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। রাত কত কে জানে। হ্যারিকেন নিভে গেছে। একটা প্রচণ্ড অস্বস্তি। খাটের ওপর উঠে বসতে গেলাম। মাথার মধ্যেটা প্রচণ্ড ভার। কিন্তু ভীষণ তেষ্টা। জোর করে উঠতে গিয়েই কিসের যেন স্পর্শ পেলাম। হিলহিলে রোঁয়া রোঁয়া কি যেন আমার দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। কি ওগুলো, অনেকটা সাপের মত শরীর—কিন্তু সাপ বা কোন চেনা সরীসৃপ তো নয়—

হঠাৎ পাশ ফিরতেই চোখে পড়লো খাটের ধারের সেই জানলাটা

হাট করে খোলা। কেউ কি বাইরে থেকে খুলে দিয়েছে? আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ, একটা হালকা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। তার কিছুটা ঘরের মধ্যেও। সাপের মত সেই লকলকে বিচিত্র শুঁরগুলো এগিয়ে আসছে জানলার বাইরে থেকে, অসংখ্য। অন্ধকারটা চোখে কিছুটা সয়ে যেতে বুঝতে পারলাম—ওগুলোর রঙ সবুজ, গায়ে হালকা রোম জাতীয়। শুঁড়ের ডগার কাছগুলোতে শুঁয়াগুলো বেশ বড়সড়—কিন্তু ওগুলো কি? কি জাতীয় প্রাণী? আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠল—সাবধান! ওগুলো মারাত্মক কোন কিছু।

ছিটকে সরে যাবার আগেই একটা শুঁড় এসে জড়িয়ে ধরলো আমার ডান পা-টা, ঠিক সাপের মতো পেচিয়ে। একি দারুন বিপদে পড়লাম, হে ভগবান! হঠাৎ মনে পড়লো কোমরের পাশে গোঁজা ভোজালীটার কথা। ওটা আজ সঙ্গে নিয়েই শুয়েছিলাম। চকিতে বার করেই কোপ লাগালাম শুড়টার ওপর। চটচটে কালো তরল পদার্থ বেরিয়ে এল ওটা থেকে। শুঁড় আলগা হোল। কিন্তু ততক্ষণে আর একটা জড়িয়ে ধরেছে আমার কাঁধটার কাছে। আর একটা কিলবিল করে-এগিয়ে আসছে কোমরটার দিকে—আমি তখন প্রাণপনে ভোজালিটা চালিয়ে—একটার পর-একটা শুঁড় কাটবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি—কিন্তু শুঁড় যে অসংখ্য—আরও এগিয়ে আসছে জানলাটার বাইরে থেকে—আরও—কিন্তু এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি আসলে ওগুলো কি।

শরীরটা ক্রমেই অবসন্ন বোধ করছি—কয়েকটা শুঁড় শরীরটাকে আমার যেন শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে—কিছুতেই আর ছাড়ান যাচ্ছে না। ওগুলোর ডগার কাছগুলো অমন লালচে হয়ে উঠছে কেন? আসলে ওগুলো কি তাহলে আমার রক্ত শোষণ করছে? ভাবতেই শিউরে উঠলাম।

ছুম ছুম আওয়াজটা দূর থেকে আবার শোনা গেল— সেই সঙ্গে

কি যেন একটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার শব্দ। মাথার মধ্যেটা আমার ঝিমঝিম করছে।

হঠাৎ দৃষ্টিটা পড়লো জানলার বাইরে। অন্ধকারে চোখটা তখন অনেক খানি সয়ে এসেছে। জানলাটার পাশেই একটা মোটা গাছের গুঁড়ির মতো কি রয়েছে—সেখান থেকেই শুঁড়গুলো জানলা গলিয়ে ঢুকছে ঘরের মধ্যে। জানলা গরাদহীন। ওই অবস্থার মধ্যেও একটু একটু যেন অনুমান কবতে পারছি—ওটা নিশ্চয়ই কোন হিংস্র মাংসভূক গাছ। রাতের অন্ধকারে জানলা খুলে আমার দিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

চোখ পড়লো গাছটা থেকে একটু দূরে। জগদানন্দ দাঁড়িয়ে আছে না? ওর বীভৎস মুখটা এখন আরও হিংস্র দেখাচ্ছে। জ্বলজ্বলে চোখ দুটো আমার দিকেই নিবদ্ধ।

মনে পড়লো স্ত্রীর কথা, ঘরে রেখে আসা দুবছরের ছেলে টুটুলের কথা, মায়ের কথা—এদের আর কোনদিন দেখতে পাব না। কেউ জানতে পাবে না কোথায় কি ভাবে হারিয়ে গেছি আমি। দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়লো ঠোঁটের কাছে—নোনতা স্বাদ পেলাম। ভগবান কে একবার ডাকলাম অস্ফুটস্বরে।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ।

খুব কাছে পিঠে শব্দটা উঠে অন্ধকারের স্তব্দতাকে যেন চুরমার করে দিল। চমকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি জগদানন্দ ভূত দেখার মতো লাফিয়ে উঠেই ছুটতে গিয়েই দিকভ্রান্ত হয়ে আছড়ে পড়লো জানালার ধারের ক্ষুধার্ত মাংসভুক গাছটার ওপর। নিমেষে ম্যাজিকের মতো আমার শরীর থেকে শুঁড়গুলো খুলে গিয়ে হিল হিল করে বাইরে বেরিয়ে গেল; তারপর প্রায় নিমেষের মধ্যেই ওগুলো একসঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো জগদানন্দের শরীরটা।

আমি আচ্ছন্নের মতো বিছানায় পড়েছিলাম।

দরজায় করাঘাতের শব্দ। সেই সঙ্গে পরিষ্কার ইংরাজীতে

উত্তেজিত গলায় স্বর—দরজা খুলুন! কে আছেন। আর ভয় নেই।

কার গলার স্বর? তবে যে শুনেছিলাম জঙ্গলের এই আধ-পোড়ো বাড়ীটাতে জগদানন্দ ছাড়া আর কেউ থাকে না।

করাঘাত বেড়েই চলেছে—দরজা খুলুন। ঈশ্বরের দোহাই!

নিজের অজান্তেই এক সময় টলতে টলতে উঠে ঘরের খিলটা খুলে দিয়েছিলাম। তারপর জ্ঞান হারিয়ে টলে পড়ার আগে অনুভব করলাম দুটো উষ্ণহাত আমায় ধরে ফেললো।

জ্ঞান ফিরেছিল টানা চব্বিশ ঘণ্টা বাদে। চোখ খুলতেই সামনে যাকে দেখলাম—তিনি প্যান্ট-সার্ট পরা, উস্কোখুস্কো চুল এক বৃদ্ধ। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে ঝুঁকে তাকিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে চোখে চোখ মিলতেই প্রসন্ন হাসিতে মুখটা ভরে গেল ওঁর। পরিষ্কার ইংরাজীতে বললেন—আর ভয় নেই।

এ তো সেই কণ্ঠ! আর চিনতে ভুল হোল না, ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম—আপনিই ড: আর, শ্রীনিবাসন?

তেমনি প্রসন্ন হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন—কিন্তু আর কথা নয়, আপনি এখনও খুবই দুর্বল। আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন। আমি ঔষধ দিচ্ছি।

সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আরও একটা দিন কেটে গেল। মাংসভুক বিষাক্ত অর্কিড সে রাতে আমার শরীরের অনেকটা রক্তই শুষে নিয়েছিল।

হ্যাঁ, সে রাতের ওই সবুজ হিলহিলে শুঁড়গুলো ছিল—একপ্রকার রাক্ষুসে অর্কিড জাতীয় গাছের প্রত্যঙ্গ। ড: শ্রীনিবাসনই কয়েক বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার এক গভীর জঙ্গল থেকে এ দুস্প্রাপ্য জাতীয় গাছের চারাটি সংগ্রহ করে এনে তাঁর ল্যাবরেটারী সংলগ্ন নার্সারীতে রোপন করেছিলেন। এ ধরনের ছোটখাট মাংসভুক অর্কিড দক্ষিণ আমেরিকা এবং পৃথিবীর কোন কোন অংশে খুবই দেখা যায়। এদের

মধ্যে বিচিত্র সব শ্রেণী আছে। ইংল্যাণ্ডে 'সানডিউ' নামে এক ধরনের পতঙ্গভুক বৃক্ষ দেখা যায়। 'জার' জাতীয় কিছু গাছও আছে। এরা প্রত্যেকেই নানা উপায়ে পোকামাকড় আকৃষ্ট করে তাদের ফাঁদে ফেলে শিকার করে খায়। কিন্তু আমি সে রাতে যে ক্ষুধার্ত বৃক্ষটির খপ্পরে পড়েছিলাম—তা সত্যিই এক বিচিত্র জাতের রাক্ষুসে মাংসভুক অর্কিড। এই মারাত্মক বৃক্ষের চারাটি হঠাৎই খুঁজে পেয়েছিলেন ডঃ শ্রীনিবাসন। দিনে দিনে এর আকার এবং ক্ষুধা দুইই বেড়েছে প্রচণ্ড। এ জাতীয় গাছগুলির সাধারণতঃ 'ফোটোসিনথেসিস' পদ্ধতিতে আহার আহরণের পন্থা জানা থাকে না, তাই আবশ্যক মতো অন্য জীবন্ত প্রাণীকে ফাঁদে ফেলে তার শরীরের রক্ত মাংস হজম করেই সে তার রাক্ষুসে ক্ষিদে মেটায়।

ডঃ শ্রীনিবাসনের মুখ থেকে শুনছিলাম তার বিচিত্র রাক্ষুসে অর্কিডের কথা। সমস্ত ঘটনা গুলোই উনি একে একে খুলে বললেন। তা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অদ্ভুত!

সে রাতে 'দুম দুম' শব্দটা শ্রীনিবাসনই করেছিলেন। গত দুমাস যাবৎ জগদানন্দ ডঃ শ্রীনিবাসনকে এ-বাড়ীতেই একটা ঘরে বন্দী করে রেখেছিল।

আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম—কিন্তু কেন?

—কারণ আমি তাকে নিবৃত্ত করতে চেয়ে ছিলাম। ডঃ শ্রীনিবাসন মুখের পাইপে অগ্নি সংযোগ করলেন।

—কি থেকে আপনি ওকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন? আমি প্রশ্ন করি।

—এক ভয়ঙ্কর নেশা থেকে।

—নেশা! কৌতুহল আমার তীব্র হয়ে ওঠে। কিসের নেশা?

ডঃ শ্রীনিবাসন এবার উঠে সারা ঘরে পায়চারী করতে করতে শুরু করলেন—ওই মাংসভুক বিশেষ জাতীয় অর্কিডটায় এক ধরণের ফুল

ফোটে। তার নেশা ধরা, তীব্র বুনো গন্ধ। আসলে ওই গন্ধ ছড়িয়ে সে তার শিকারকে আকৃষ্ট করে। জগদানন্দ ওই ফুলের মধুর নেশায় মজেছিল।

—বলেন কি?

—হ্যাঁ, বিচিত্র উপায়ে সে গাছ থেকে ফুল পেড়ে মধু সংগ্রহ করতো তারপর তার মধুটুকু নিংড়ে পান করে আকণ্ঠ নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতো।

—আশ্চর্য! বিস্ময় ও উত্তেজনায় আমি অধীর হয়ে উঠলাম। ডঃ শ্রীনিবাসন চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন —লোকটা চিরকালই নেশাড়ে কিন্তু অমানুষ ছিল না, অর্কিডের নেশা ওকে অমানুষ করেছিল। আমি জানতে পেরে ওকে ধমকালাম, ভয় দেখিয়ে ওই মারাত্মক নেশা থেকে ওকে নিবৃত্ত করতে চাইলাম, কিন্তু ফল হোল উল্টো। একদিন রাতের গভীরে অতর্কিতে আমায় বন্দী করে একটা ঘরে পুরে রেখে ও ওর নেশার দাসত্ব করতে লাগলো।

বাকিটা ডঃ শ্রীনিবাসন বলার আগেই বুঝে নিতে আমার দেরী হোল না। অর্কিডের নেশায় বাঁধা পড়েছিল বলেই সবকিছুর বিনিময়েও ওই মাংসভুক গাছটাকে বাঁচানই ওর একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল! কিন্তু জনপ্রাণীহীন এই জঙ্গলে কতদিন আর পাখী কিংবা ছোটখাট জীবজন্তু জোগাড় করে ওই রাক্ষুসে গাছের ক্ষিদে মেটানসম্ভব! অবশেষে নিজের নেশার রস জোগাড় করতে গাছকে আপন শরীরের রক্ত পর্যন্ত নিংড়ে দিয়েও ওর ক্ষুধার সাময়িক নিবৃত্তি করতে হচ্ছিল— ঠিক এমনই সময় এক রাতে আমার প্রবেশ। জগদানন্দ হাতে যেন স্বর্গ পেল। আমায় ফাঁদে ফেলে গাছের ক্ষিদে মেটাবার সমস্ত ব্যবস্থাই সে পাকা করে রেখে ছিল। এমন একটা তাজা খাবার দিতে পারলে অন্ততঃ বেশ কয়েকদিন তো ওর পৈশাচিক ক্ষিদে মিটিয়ে নিশ্চিন্তে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা যেত। আর এই মতলবেই রাত্রে আমায় বেহুঁশ করে রাখার জন্যে অতিথি সৎকারের নাম করে ওই অর্কিডের ফুলের মধুর সরবৎই আমায় এক গ্লাস খাইয়েছিল জগদানন্দ।

কি নিদারুণ অতিথি সৎকার !

কিন্তু সবকিছুই ভেস্তে গেল একেবারে চরম মুহূর্তে ডঃ শ্রীনিবাসন ঘরের দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসায়। সে রাতে গুলিটা উনিই ছুঁড়েছিলেন।—জগদানন্দকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ফল হোল অভাবিত। হতচকিত হয়ে পালাতে গিয়ে অর্কিডের ওপরই আছড়ে পড়লো লোকটা। আর তার ফলেই অর্কিডের জীবন্ত শুড়গুলো আমায় ছেড়ে ওকেই আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে ধরলো।

সন্ধ্যের একটু আগে ডঃ শ্রীনিবাসনের সঙ্গে পেছনের বাগানের ওই রাক্ষুসে গাছটার কাছে গিয়েই চমকে উঠলাম।

বীভৎস দৃশ্য।

গাছটা পড়ে আছে স্থির হয়ে একটা ভরপেট অক্টোপাসের মতো। শুঁড়গুলোয় তখনও লালচে ভাব। আমরা কাছে এগুতেই ওগুলো একটু একটু করে তুলতে শুরু করলো কিন্তু ওর গোড়ায়—কেও ? একটা ফ্যাকাশে কঙ্কাল কুঁকড়ে গুটিয়ে পড়ে রয়েছে—ওই কি জগদানন্দ !

আমি শিউরে উঠলাম। মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে উঠলো। বোধহয় পড়েই যেতাম—তার আগেই ডঃ শ্রীনিবাসন আমার কাঁধটা ধরে ফেললেন। বী ষ্টেডি মিঃ সেন। জগদানন্দ নিজের পাপেই মরেছে। ওর মৃত্যুর জন্য একমাত্রও নিজেই দায়ী।

বলতে বলতে দূর থেকে গাছটার ওপর কী একটা এ্যাসিড ছুঁড়ে দিলেন ডাক্তার। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো গাছের দেহটা। আর সঙ্গে সঙ্গে ওই রাক্ষুসে অর্কিডের সমস্ত প্রত্যঙ্গগুলো আলোড়িত হতে শুরু করলো ভয়ঙ্কর ভাবে, যেন প্রচণ্ড প্রতিহিংসায় ওর শুঁড়গুলো লকলকিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। তারপর একসময় স্থির হয়ে নেতিয়ে পড়লো, আগুন ছড়িয়ে পড়লো ওর সারা শরীরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিছু ছাই আর কয়েক টুকরো দগ্ধাবশেষ ছাড়া আর কিছুই পড়ে রইলোনা সেখানে।

সব শেষ হয়ে যাবার পর ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এতদিনে শেষ হোল।

ডঃ শ্রীনিবাসনের কণ্ঠে কি বিষাদের সুর শুনলাম? আশ্চর্য!

পরদিন যাবার সময় উনি অনেকটা পথ সঙ্গে এলেন।

গাড়ীতে বসে ষ্টার্ট দেবার আগে শেষবারের মতো কৃতজ্ঞচিত্তে বললাম—আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। সে-রাতের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আপনি এসে হাজির না হলে—বলতে বলতে ডঃ শ্রীনিবাসনের দিকে তাকিয়ে থমকে গেছি। ওঁর দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ রয়েছে জংলা বাগানের সেই দিকে, যেখানে এখনও পড়ে রয়েছে সেই রাক্ষুসে অর্কিডের শেষ দগ্ধাবশেষ। কিন্তু ওঁর দৃষ্টি এত বিষণ্ন কেন? তবে কি, যে দুষ্প্রাপ্য চারাটিকে একদিন বহুদূর থেকে তুলে এনে নিজের হাতে ওই বাগানে রোপণ করে লালন করেছিলেন—ধীরে ধীরে নিজের আজান্তেই ভালবেসে ফেলেছিলেন—যদিও তা এক নৃশংস মাংসভুক বৃক্ষ!

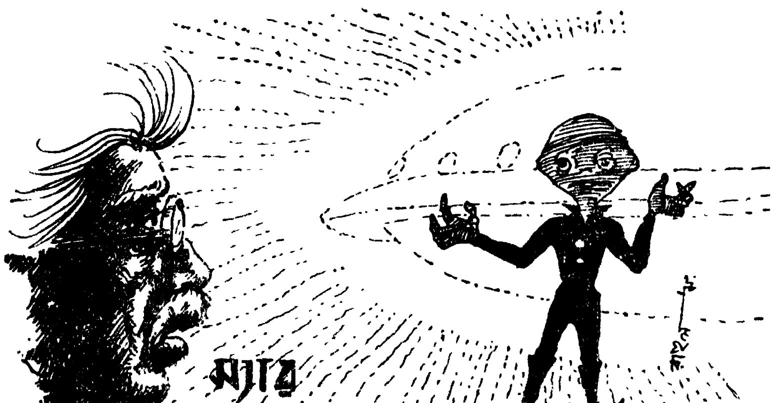
একি ভালবাসা—না নেশা? হয় তো জগদানন্দের মতো নয়—তবু এ নেশা একটা মানুষ কে বছরের পর বছর ফেলে রাখে লোকালয় থেকে দূরে কোন জংলা বাগান ঘেরা আধা পোড়ো বাড়ীর মধ্যে।

এ নেশা প্রকৃতির অজানা রহস্যকে জানবার।

গাড়ী ছুটে চলেছে তীব্রগতিতে। বন্ধুর কাছে গিয়ে পৌঁছব নির্দিষ্ট সময়ের তিনদিন পরে। ওকে যখন গত তিনদিনের সব কথা বলবো—ও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না।

ভাববে একা জঙ্গলের পথে আসার সময় গাড়ী থামিয়ে আমি কোথাও বেহুঁশ হয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম—হয় তো কোন নেশার ঘোরে!

আপন মনেই হেসে উঠে গাড়ীর এক্সিলেটারে আরো জোরে চাপ দিলাম—।



স্যার সত্যপ্রকাশের সুদূর দর্শন

টাঙ্গা গাড়ীর ঘোড়াটা একটানা ঝুম ঝুম শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে দৌড়ে চলেছিল চড়াই উৎরাইএর পথ বেয়ে। মাঝে মাঝে কোচোয়ানের ছিপটির শব্দ সেই সঙ্গে তার বিচিত্র স্বরভঙ্গি। টাঙ্গার মধ্যে আমি ছাড়া আর একজন একধারে ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছে—সে ন্যাদা। ন্যাদা স্যার সত্যপ্রকাশের চাকর—একাধারে বোবা এবং কালা। শুধু চাকর বললে তার সম্পর্কে সব বলা হয় না, কারণ বাংলাদেশ থেকে সুদূর রাজস্থানের অখ্যাত রতনপুর গ্রামে স্যার সত্যপ্রকাশের দশ বছরের নির্বাসিত জীবনে ন্যাদাই তাঁর একমাত্র সঙ্গী। লোকটার বেঁটে খাটো মজবুত দেহ। বয়স প্রায় ষাট—যদিও চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই।

গত তিনদিন আগে কলকাতায় বসে হঠাৎ স্যার সত্যপ্রকাশের একটা চিঠি পাই। রেজেষ্ট্রি চিঠি। তাতে মাত্র কয়েকটা কথা ঃ

"প্রিয় স্বপন,

এতদিন পর আমার কাছ থেকে এ চিঠি পেয়ে তুমি অবাক হবে জানি। কিন্তু আমার অনুরোধ এ চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি অবশ্যই আ·ার এখানে চলে এস। কারণটা চিঠিতে লেখা সম্ভব

হচ্ছে না। তবে এখানে এক বিরাট বিস্ময় তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। রাজস্থানের যোধপুর শহর থেকে আমার বর্তমান আবাসস্থলে ট্রেণে আসতে সময় লাগে মাত্র ছ' ঘণ্টা। ষ্টেশনে গাড়ী থাকবে। অসুবিধে হবে না।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো।

ইতি—

তোমাদের

স্যার সত্যপ্রকাশ

পুনঃ—এ চিঠির কথা আপাততঃ সম্পূর্ণ গোপন রাখবে।"

দশ বছর বাদে স্যার সত্যপ্রকাশের আচমকা এমন চিঠি পেয়ে সত্যি বলতে কি প্রথমটা বেশ হকচকিয়েই গিয়েছিলাম। ব্যাপারটায় কোন গুরুত্ব দেবো কিনা সেটা ভেবে ঠিক করতেই পুরো একদিন চলে গেল, কারণ স্যার সত্যপ্রকাশ মানুষটাই এক অদ্ভুত চরিত্রের।

ভূ ভারতে ওঁর সত্যিই বুঝি জুড়ি নেই!

মানুষটা শুধু অদ্ভুতই নয়—ওঁর জীবনটাও ভারী বিচিত্র।

মাত্র ন'বছর বয়সেই নাকি স্যার সত্যপ্রকাশের মধ্যে বিজ্ঞান প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল। তারপর অল্পবয়সের মধ্যেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন।

কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণার চিরাচরিত ধারায় নিজস্ব খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের আকাঙ্খা কোনদিনই ওঁর ছিল না। মনটাও লাগামহীন, তাই কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে কিছুদিন মাত্র অধ্যাপনা করেই কলেজ ছেড়ে গ্রামের পৈতৃক বাড়ীতে একটা ছোটখাট গবেষণাগার তৈরী করে স্বাধীন গবেষণা শুরু করলেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তুগুলিও ছিল বড় অদ্ভুত। কেঁচোর জীবনীশক্তি এবং আকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃষি জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি, শব্দ তরঙ্গকে কাজে লাগিয়ে বাদুরের মতো অন্ধ মানুষের সহজে চলার উপায় উদ্ভাবন ইত্যাদি। অবসর সময়ে গ্রামের গরীব মেধাবী ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষা

দিতেন। তিনি ছিলেন তাদের প্রিয়—স্যার সত্যপ্রকাশ। বিজ্ঞানের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল যে, বিজ্ঞান গবেষণা যদি মানুষের সামগ্রিক কল্যানের পথে নিয়োজিত না থাকে তবে তা দেরী না করে বন্ধ করে দেয়া উচিত। এ পৃথিবীতে আর একটা হিরোসিমা নাগাসাকি যেন কিছুতেই সৃষ্টি না হয়।

আর এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ছিল আপোষহীন।

কিন্তু তাঁর এসব পরিকল্পনা কিংবা গবেষণাকে কেউই বিশেষ পাত্তা তো দেয়ই নি বরং অনেকেই তাঁকে পাগল ভাবতে শুরু করেছিল। স্যার সত্যপ্রকাশ অবশ্য তাঁর সম্পর্কে কে কি ভাবলো তা নিয়ে কোনদিন বিশেষ বিচলিত ছিলেন না।

কিন্তু তবু তিনি স্বদেশে নিজের গবেষণাগারে বেশীদিন নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারলেন না। তাঁর অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁ স্ত্রী ছেলেমেয়েরাও তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিল এমনকি মেণ্টাল এ্যাসাইলামে পাঠাবার ব্যবস্থাও নাকি তারা ভেতরে ভেতরে পাকা করে ফেলেছিল। শেষ মুহূর্তে স্যার সত্যপ্রকাশ জানতে পেরে একদিন কলকাতা ছেড়ে ডুব মারলেন—অর্থাৎ পালালেন সঙ্গে তাঁর গবেষণার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর আর সঙ্গী বলতে সংসারে তাঁর একমাত্র অনুগত দীর্ঘদিনের চাকর ন্যাদা। বোবা-কালা এই মানুষটিকে সঙ্গে নিতে কোন ঝুঁকিই ছিল না।

এসব প্রায় দশবছর আগেকার ব্যাপার। তারপর থেকে স্যার সত্যপ্রকাশের সঙ্গে তাঁর পরিচিত স্বজনদের কোন যোগাযোগই ছি না। এতদিন পরে তাঁর কাছ থেকে এই অদ্ভুত চিঠি।

এত লোক থাকতে স্যার সত্যপ্রকাশ চিঠিটা আমাকেই বা কেন লিখলেন প্রথমটা আমিও ভেবে পাই নি তারপর অবশ্য কারণ আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। স্যার সত্যপ্রকাশের নাতি বিজয়প্রকাশ ছিল আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। সেই সূত্রে বহুদিন থেকেই ওদের বাড়ীতে আমার যাতায়াত—স্যার সত্যপ্রকাশের খিদিরপুরের বাড়ীতে থাকা

কালীনই। তাঁর আজব সব গবেষণার গল্প ওনার কাছে বসে শুনতে আমি বরাবরই আগ্রহ অনুভব করতাম, তাই ও বাড়ীতে গেলে স্যার সত্যপ্রকাশের গবেষণাগারে গিয়ে তাঁর নতুন গবেষণার গল্প শোনা আমার প্রায় অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ই দেখতাম নিজের পরিকল্পনা আর গবেষণার কথা শোনাতে শোনাতে মানুষটার চোখ দুটো কি অদ্ভুত উৎসাহে জ্বলজ্বল করে উঠতো। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে আমি সেই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকটিকে কিছুতেই উপহাস করতে পারতাম না—বরং সব কিছু না বুঝলেও প্রতি বিষয়েই আমার অকপট উৎসাহ প্রকাশ করতাম। এক সময়ে স্যার সত্যপ্রকাশ তাঁর নিজের আত্মীয়দের থেকেও আমায় বেশী আপনজন ভাবতে শুরু করেছিলেন।

স্যার সত্যপ্রকাশের চিঠি পেয়ে প্রথম দিনটা সাত পাঁচ ভাবলেও আর সময় নষ্ট করিনি। পরদিনই একটা স্যুটকেশে কিছু জামাকাপড় আর টুকিটাকি নিয়ে সোজা হাওড়ায় ট্রেনে চেপে বসেছি। প্রথমে দিল্লী, সেখান থেকে যোধপুর। যোধপুর থেকে স্যার সত্যপ্রকাশের কথামতো রতনপুর ষ্টেশনে। ষ্টেশনে যখন নেমেছি সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আগন্তুক আমি একাই। প্লাটফরম নামক বালিভরা পাথুরে জমিটায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কোনদিকে যাই ঠিক সেই সময়ে একজন বেঁটে খাটো শক্ত সমর্থ প্রৌঢ় আমার সামনে এগিয়ে এসে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসলো। কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারলাম —ও ন্যাদা। ও কিন্তু আমায় এতদিন বাদে দেখেই চিনতে পেরেছে। ষ্টেশনের পাশেই টাঙ্গা দাঁড়িয়েছিল। আমরা দুজনে উঠে বসতেই কোচোয়ান ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সেই থেকে ঝুমঝুম শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে টাঙ্গা গাড়ীর ঘোড়া ছুটে চলেছে।

এক নাগাড়ে বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ চমক ভাঙলো একটা কড়া হাতের স্পর্শে। চমকে চোখ খুললাম। ন্যাদা আমার পিঠে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকছে।

তাকিয়ে দেখি ঝাপসা অন্ধকারে ধু ধু মাঠের মধ্যে টাঙ্গাটা একটা বড়সড় পুরনো ভাঙা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে।

আমায় আর কিছু ভাববার অবসর না দিয়ে ন্যাদা টাঙ্গার ভাড়া মিটিয়ে আমার সুটকেশটা হাতে তুলে নিল তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আর একবার আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

অগত্যা ন্যাদাকে আমি নীরবে অনুসরণ করলাম।

প্রথম দরজাটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটা বড় বাগান। তাতে নানা বিচিত্র গাছ গাছালি—অদ্ভূত সব ফুল ফুটে রয়েছে। বাগানটা পেরুতেই একটা ঘর। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ন্যাদা বন্ধ দরজায় তিনবার টোকা দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যে মানুষটা আমার সামনে বেরিয়ে এলেন তাঁকে দেখে চিনতে আমার একটু ও দেরী হোল না, এক মাথা ধবধবে সাদা চুল, না ছাটা গোঁফ চোখে পুরনো প্যাটানের চশমা কিন্তু চোখের সেই আশ্চর্য দীপ্তি— গত দশ বছরে যেন অনেক গুণ বেড়েছে।

আমি কিছু বলার আগেই স্যার সত্যপ্রকাশ আমায় দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমার চিঠি পেয়ে তুমি না এসে পারবে না এ আমি জানতাম স্বপন। তাইতো পৃথিবীতে তোমাকেই সব থেকে বেশী ভরসা করি।

দীর্ঘ দশ বছর পরে দেখা, কিন্তু মানুষটা এক মুহূর্তেই তাঁর অকপট আন্তরিকতায় আমায় যেন আরো আপন করে নিলেন। উনি আমায় একরকম টেনেই নিয়ে গেলেন বাড়ীর মধ্যে। একটা সুন্দর, সুসজ্জিত ঘর। সেখানে উনি আমায় কিছু বলার অবসর না দিয়ে আমার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, 'আজ আর কোন কথা নয়। অনেকটা পথ এসেছ। দেখেই বুঝেছি তোমার এখন বিশ্রাম দরকার। ন্যাদা সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। হাত মুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে

তাড়াতাড়ি শুয়ে পড। আগামী কাল তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে'।

সত্যি! তখন আমার সারা শরীর জুড়ে ক্লান্তি নেমেছে। গত প্রায় আটত্রিশ ঘণ্টা এক নাগাড়ে জার্নি করেছি। সেদিন রাত্রের মতো আর কোনদিকে না তাকিয়ে হাত মুখ ধুয়ে দাদার হাতের চাপাটি আর মাংস খেয়ে বিছানায় শুয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো তখন বেশ বেলা হয়েছে। জানলা দিয়ে দেখলাম বাইরের পৃথিবীতে রোদ্দুর ঝলমল করছে। হাত মুখ ধুয়ে আনুষঙ্গিক কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে দেখলাম দাদা আমার জন্যে ব্রেকফার্স্ট নিয়ে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু এভাবে আমি একা ঘরে বসে চা-পুরি খাবো কেন? স্যার সত্যপ্রকাশ কোথায়? দাদাকে জিজ্ঞেস করেও কোন ফল হোল না। তবে ওর হাত পা নাড়া ইশারা দেখে ওর বক্তব্য বুঝলাম স্যার সত্য প্রকাশের জন্যে বসে না থেকে আমি যেন ব্রেকফার্স্ট সেরে ফেলি

কিন্তু কারণটা কি?

বোবা-কালা মানুষটা হাবাধা গোঙানিতে যা বলতে চাইলো তা শুধু আমি কেন—শিবের বাবারও বোধ হয় বোঝা অসাধ্য।

অগত্যা গৃহ স্বামীর উপস্থিতি ছাড়াই অতিথিকে প্রাতরাশ সারতে হোল। মনকে বোঝালাম—স্যার সত্যপ্রকাশ মানুষটার শিষ্টাচারের ব্যাকরণ একটু স্বতন্ত্র হলে আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু সারাদিনের মধ্যে একবারও মানুষটার দর্শন মিললো না। ল্যাবরেটারী ঘরের দরজা বন্ধ। তার মানে সকাল থেকেই তিনি ওখানে ঢুকেছেন।

তাহলে আমায় এভাবে তড়িঘড়ি রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠালেন কেন? রাজস্থানের এই অখ্যাত রতনপুরে ধু ধু মাঠের মধ্যে তাঁর এই বিরাট পোড়ো বাড়ীর শোভা দেখাতে?

সারাটা দিন একা মাঠে মাঠে ঘুরে কিছু জংলা কাঁটা ঝোপ,

নুড়ি পাথর, বালি আর কিছু নাম না জানা পাখী ছাড়া আশ পাশে একটা মানুষও চোখে পড়লো না।

সন্ধ্যে বেলা বিরক্ত ভাবে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম পরদিন ভোরেই এই আধপাগোল মানুষটার খপ্পর থেকে চম্পট দেব কিনা ঠিক এমনি সময়ে বাড়ীর সদর দরজার মুখটাতেই দেখি স্যার সত্যপ্রকাশ দাঁড়িয়ে আছেন।

আমায় দেখেই তিনি এক গাল হেসে কয়েক পা এগিয়ে এলেন, কি ইভিনিং ওয়াক হোল ?

সারাদিনে অনেক ক্ষোভ জমে ছিল, কিন্তু স্যার সত্যপ্রকাশের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারলাম না—শুধু একটু শুকনো হাসলাম।

উনি আমার হাত ধরে ল্যাবরেটারী ঘরের একেবারে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ল্যাবরেটারী ঘরটা বেশ বড়। চারিদিকে সব অদ্ভুত যন্ত্রপাতি সাজানো। সারিসারি টেষ্টটিউব, বুনসেন বার্ণার, আরোও কত কি। পাণ্ডববর্জিত এই দেশের নির্বান্ধব পুরীতে স্যার সত্যপ্রকাশ এক আশ্চর্য ল্যাবরেটারী গড়ে তুলেছেন।

একটা চেয়ারে বসে চতুর্দিকে চোখ বুলোচ্ছি হঠাৎ স্যার সত্যপ্রকাশের ভারী স্বর কানে এল, স্বপন, তুমি তো সাহিত্যের ছাত্র সেক্সপীয়ার পড়েছ ?

চমকে স্যার সত্যপ্রকাশের মুখের দিকে তাকালাম। ওঁর মুখটা হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেছে। আমার চোখের দিকে স্থির গভীর দৃষ্টি রেখে বললেন, বহুকাল আগে পড়েছিলাম হ্যামলেট নাটকের সেই বিখ্যাত লাইনগুলো......

"There are more things in heaven and earth Haratio, than are dreamt of in your philosophy—,"

আমি বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম স্যার সত্যপ্রকাশের দিকে —কি বলতে চায় মানুষটা ?

একটু থেমে স্যার সত্যপ্রকাশ শান্ত অথচ গম্ভীরকণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, 'আজ দীর্ঘ দশ বছর পর আমি তোমায় অতদূর থেকে এখানে ডেকে এনেছি আমার জীবনের সব থেকে বড় দর্শন আর অভিজ্ঞতার কথা শোনাবার জন্যে। কিন্তু তার আগে তোমায় কথা দিতে হবে আমার কাহিনী যত অবিশ্বাস্যই মনে হোক তুমি তা উড়িয়ে দেবে না এবং একজন মানুষ হিসেবে তোমার যতটুকু করণীয় নিশ্চয়ই করবে'—!

স্যার সত্যপ্রকাশের চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি আর কণ্ঠে যেন সাপ খেলানো বাঁশীর সুর। হেঁয়ালি হলেও ওনার প্রশ্নকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার ছিল না; নিজের অজান্তেই আমি ঘাড় নাড়লাম।

এরপর স্যার সত্যপ্রকাশ শুরু করলেন তাঁর সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বিবরণ—

ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের রাত। কালো আকাশটা যেন নক্ষত্রের চুমকি বসানো কালো শাড়ীর মতো পাতা রয়েছে। অন্যান্য দিনের মতো সে রাতেও স্যার সত্যপ্রকাশ তাঁর ল্যাবরেটারী ঘরে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ব্যস্ত।

হঠাৎ এক অদ্ভুত আলোর বন্যা এসে তাঁর সারা ঘর ভাসিয়ে দিল। আলো আসছে খোলা জানলা পথে। স্যার সত্যপ্রকাশ খোলা জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জানলার ঠিক ধারেই বিরাট বাগান। সে দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন তিনি। আলোর উৎস সেখানেই। ক্যাকটাসের ঝোপটার পাশে এক তীব্র নীলাভ আলোর বিন্দু ক্রমেই বড় হয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে আলোর উজ্জ্বলতা। এক সময় সেই নীল আলো আশ পাশে বহুদূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে পড়লো। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে উঠলোপ্রকৃতি।

অন্ধকার রাত্রে বাড়ীর বাগানে একি অদ্ভুত আলোর রোশনাই!

স্যার সত্যপ্রকাশের জানলার মাত্র দশ পনের গজের মধ্যেই এ ঘটনা ঘটে চলেছে। আলোর উজ্জ্বলতা এতক্ষণে আরও বেড়ে গেছে এবং আবির্ভাব ঘটেছে এক ঘুরন্ত চক্রের। সেই চক্রের চারপাশ থেকে ক্ষণে-ক্ষণে বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে তীব্র নীলাভ দ্যুতি!

সেই চক্রের মধ্যগোলকটি কিন্তু স্থির। সেখানে নানা রকম আশ্চর্য যন্ত্রপাতি আর কলকব্জা, আর চালকের আসনে বসে এক অদ্ভুত দর্শন প্রাণী।

ওকি মানুষ, অথবা কোন গ্রহান্তরবাসী জীব?

খর্বাকার, শীর্ণ ওই কুৎসিৎ দর্শন জীবটা তীক্ষ্ণ একাগ্র দৃষ্টিতে স্যার সত্যপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে অনড় ভাবে বসেছিল। সে দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলার ক্ষমতা স্যার সত্যপ্রকাশ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

কতক্ষণ তাঁরা এভাবে পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়েছিলেন কে জানে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ালো আর হঠাৎ স্যার সত্যপ্রকাশ তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে এক তীব্র বিদ্যুৎতরঙ্গ অনুভব করলেন। তাঁর মনে হোল সামনের ওই অদ্ভুত দর্শন আগন্তুক তাঁর মস্তিষ্কে চিন্তার সূত্র পাঠাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য স্যার সত্যপ্রকাশের মাথাটা কেমন হাল্কা হয়ে গেল, তারপরই এক অদ্ভুত অনুভূতি। এক আশ্চর্য স্বর তাঁর মনের মধ্যে বেজে উঠলো, 'স্যারসত্যপ্রকাশ'।'

স্যার সত্যপ্রকাশ চমকে উঠলেন। আগন্তুক টেলিপ্যাথি জানে। তাঁর মুহূর্তের ভাবান্তরও আগন্তুক ততক্ষণে ধরে ফেলেছে। উত্তর এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, স্যার সত্যপ্রকাশ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আপনার ভাষা আমার জানা না থাকলেও টেলিপ্যাথিতে ভাব বিনিময়ে আমাদের অসুবিধে নেই।

স্যার সত্যপ্রকাশ মনে মনে বললেন, আপনি কে? কোন গ্রহ থেকে আসছেন আপনি?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল,—'আমি কোন গ্রহান্তরের জীব নই, হে আমার পূর্বপুরুষ, আমার বাস এই পৃথিবীতেই আপনার হিসেবে আজ থেকে পনের হাজার বছর পরে।

'পনের হাজার বছর আগামী পৃথিবী থেকে তোমার আবির্ভাব'! স্যার সত্যপ্রকাশ বোবা বিস্ময়ে যেন মূক হয়ে গেলেন।

আগন্তুক কিন্তু মোটেই বিরক্ত হোল না। সে উত্তর পাঠালো, আজকের পৃথিবীর মানুষের কাছে এমন কথা খুবই আজব শোনাবে জানি—কিন্তু পনের হাজার বছর পরে পৃথিবীর মানুষ আমরা এ বিস্ময়কে জয় করেছি। শুধু গ্রহান্তর যাত্রাই নয়, সময়কে অতিক্রম করে বেড়ানোর 'সময়-যন্ত্র'ও আমরা আবিষ্কার করেছি মাত্র কিছুদিন আগে।

"সময় যন্ত্র" অর্থাৎ যার সাহায্যে ইচ্ছা মতো অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে পরিভ্রমন করতে বাধা নেই,—স্যার সত্য-প্রকাশের বিস্ময় তখন ও কাটেনি, বলেন, কিন্তু তা তো কল্প-কাহিনীর বিষয়, বাস্তবে কখনও সম্ভব?

সম্ভব যে হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন হে আমার পূর্বপুরুষ। আগন্তুক বললো, —ভুলে যাবেন না আমাদের বাস পনের হাজার বছর ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানব গোষ্ঠী। স্যার সত্যপ্রকাশ কি বলবেন ভেবে পান না।

আগন্তুক চিন্তার তরঙ্গ পাঠালো,—তবে আবিষ্কারটা হয়েছে খুবই সম্প্রতি এবং আমিই এ পৃথিবীর প্রথম মানব সন্তান যে পরীক্ষামূলক ভাবে পৃথিবীর অতীত সময় অতীক্রমের দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

স্যার সত্যপ্রকাশ কিছুক্ষণ আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন পনের হাজার বছর ভবিষ্যৎ পৃথিবীর এই অদ্ভুত মানব সন্তানটির দিকে। কিন্তু ও এত কুৎসিত কেন। মাথাটা বিরাট, এক গাছিও চুল নেই চোখ দুটো বোয়াল মাছের মত দেহটা ছোট, সরু সরু হাত পায়ের গঠন সারা শরীরটার মধ্যে সামান্যতম সংগতিও নেই—দেখলেই মনে কেমন গা ঘিন ঘিন করা অনুভূতি জাগে!

স্যার সত্যপ্রকাশের মনের ভাব বুঝতে আগন্তুকের দেরী হয় না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে বার্তা পাঠায়, 'স্যার সত্যপ্রকাশ, পনের হাজার বছর পরে মানুষ আসবে যে পৃথিবীতে তার কল্পনাও আপনারা আজ করেন নি। সেদিন সমগ্র পৃথিবীর মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ স্থল। আজকের পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জীবজন্তু তখন হয় লুপ্ত অথবা লুপ্ত হতে আর দেরী নেই, এমনকি পৃথিবীর সুবিস্তৃত জলরাশিও প্রাণশূন্য, আর আমরা মানবজাতির যে মুষ্টিমেয় বংশধরেরা তখনও টিকে আছি তারা কুৎসিৎ, বিকৃত অঙ্গবিশিষ্ট···এজন্যে দায়ী কারা জানেন ?,

আগামী পৃথিবীর আশ্চর্য আগন্তুকের প্রচণ্ড ক্ষোভ তীব্র বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো এবার স্যার সত্যপ্রকাশের মস্তিষ্কের কোষে প্রচণ্ড ধাক্কা মারে। তিনি যন্ত্রনায় মাথা চেপে ধরেন।

জেনে রাখুন স্যার সত্যপ্রকাশ, আজকের পৃথিবীর মানুষই তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের দুর্দশার জন্যে দায়ী। সম্প্রতি পনের হাজার বছর সময়- পরিক্রমায় আমি জেনেছি আজকের সমৃদ্ধ পৃথিবী আর মাত্র একশো বছরের মধ্যেই তার রূপ বদলাবে। হিংসা, লালসা আর বিবেকহীনতার যে ইতিহাস মানুষকে বারবার কল্যাণের পথ থেকে করেছে বিচ্যুত আর মাত্র একশো বছরের মধ্যেই তা চরম পরিনতির পথে মানবজাতিকে দেবে ঠেলে—স্যার সত্যপ্রকাশ বিমূঢ় হয়ে শুনতে থাকেন পনের হাজার বছর ভবিষ্যৎ বংশধরের তীব্র ভৎর্সনা—এগিয়ে আসছে ভয়াবহ আণবিক যুদ্ধ—যা পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থান দেবে পাল্টে। একটার পর একটা মহাদেশ তলিয়ে যাবে প্রচণ্ড জলচ্ছ্বাসে। ধ্বংস হবে মানব-জাতির এতদিন ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা বিলাসী পৃথিবী। আর যে অবশিষ্ট মানুষ বাঁচবে, মহাজাগতিক তীব্র বিষাক্ত রশ্মি তাদের মধ্যে আনবে এক কদাকার পঙ্গু বিবর্তনের রূপ—যে অভিশাপ পনের হাজার বছর

পরেও মানুষ পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারবে না। অতীত ঐতিহ্যের সবকিছু ফিরে পেলেও আর কোনদিন মানুষ ফিরে পাবে না স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য আর জীবনের সংগতি ··চিরকাল তারা তাদের বর্বর, হৃদয়হীন পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে যাবে ঘৃণার থুৎকার,—ভবিষ্যৎ মানুষের পাঠানো চিন্তার তরঙ্গ স্যার সত্যপ্রকাশের মস্তিষ্কের কোষে কোষে যেন তীব্র ছুঁচের মতো বিঁধতে থাকে।

সে আগুনের মতো ঝলসে উঠে আজকের মানুষের কাছে কৈফিয়ৎ চায়,—বলতে পারেন, আজকের মানুষের এ পাপের ফল পনের হাজার বছর পরেও মানুষকে ভোগ করতে হবে কেন? কোন অপরাধে অপরাধী মানব জাতির আগামী বংশধরেরা? বলুন স্যার সত্যপ্রকাশ—উত্তর দিন?

তীব্র চিন্তাতরঙ্গ স্যার সত্যপ্রকাশের মস্তিষ্ক ছাড়িয়ে তাঁর শরীরের সমস্ত অণুপরমাণুতে অসহ্য দহন সৃষ্টি করে চলে। সে প্রচণ্ডতা সহ্য করার শক্তি ধীরে ধীরে তাঁর লুপ্ত হয়। চোখের সামনে একরাশ ধোঁয়া...মাথার মধ্যে যন্ত্রণার ষ্টীমরোলার···স্যার সত্যপ্রকাশ ল্যাবোরেটারী ঘরের মেঝেতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান!

যখন জ্ঞান ফিরলো সকাল হয়েছে। স্যার সত্যপ্রকাশ ল্যাবোরেটারী ঘরের জানালা দিয়ে দেখলেন সামনের বাগান নরম রোদ্দুরে ঝলমল করছে। গাছে গাছে নাম না জানা পাখীর দল। স্যার সত্যপ্রকাশের মাথার কাছে তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছে তাঁর জীবনের একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী—বোবা কালা ন্যাদা।

ন্যাদার কাঁধে হাত রেখে তিনি উঠে বসলেন।

চড়াই উৎরাই এর পথ বেয়ে টাঙ্গাটা আমায় নিয়ে ফিরে চলেছে রতনপুর ষ্টেশানের দিকে। সেখান থেকে ফিরতি ট্রেণ ধরে যাবো দিল্লী হয়ে কলকাতায়—আমার আপন জীবন ক্ষেত্রে। গত সাত দিনে আমার সঞ্চয় বলতে স্যার সত্যপ্রকাশের সেই আজব অভিজ্ঞতা এবং

সুদূর দর্শন। সমস্ত ঘটনাটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কিনা এ সন্দেহের কথা স্যার সত্যপ্রকাশের কাছে চেষ্টা করেও জানতে পারিনি, কারণ আমি জানি ব্যাপারটা আসলে যাই হোক স্যার সত্যপ্রকাশ নিজে তসর্বান্তঃকরণে সত্য বলেই বিশ্বাস করেন। নইলে অচিরেই সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত জানিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলকে পৃথিবীর আশু সবনাশ সম্পর্কে সাবধান করে চিঠি দেবার কথা তিনি ভাববেন কেন?

তবে এতদিন পরে একটা ব্যাপারে স্যার সত্যপ্রকাশকে খুবই আনন্দিত মনে হোল। শেষ পর্যন্ত মনের কথাটা আমার কাছে আর চেপে রাখতে পারেননি,এক মুখ হেসে বলেছেন,—বুঝলে স্বপন, আগুন কখনও চিরদিন ছাই চাপা থাকে না—নইলে আজ আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলোকে তোমরা ঠাট্টা করলে কি হবে, পনের হাজার বছর পরের মানুষের বংশধরেরা কিন্তু এই শর্মার কাছেই প্রথম এসে তাদের সমস্যার কথা জানিয়ে গেছে। তারা কি এতই গবেট বলতে চাও?

আরে রাম! তাই কি হতে পারে!

সারাটা পথ চলতে চলতে সে কথাই ভাবছিলাম—সত্যি! স্যার সত্যপ্রকাশের মতো এমন ভাগ্য ইতিহাসে আর কোন মানুষের হয়েছে?

অন্তুতঃ আমার জানা নেই!

——



ঘটনাটা ঘটেছিল পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে কোন এক দ্বীপের কাছাকাছি এক 'লাইট হাউস' বা বাতি-ঘরকে কেন্দ্র করে। 'লাইট-হাউস' জিনিসটা কি তোমরা হয়তো জান। সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে অথবা সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ চলাচলের পথে যেখানে ডুবো পাহাড়ের অস্তিত্ব বিপজ্জনক, সেখানে বিপদ এড়াবার জন্যে সরকার অনেক সময় একটা উঁচু গম্বুজাকৃতি বাড়ি বানিয়ে তার ওপর সারারাত আলো জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে রেখে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে চলাচলকারী জাহাজকে হুঁশিয়ার হওয়ার সুযোগ দেন। সাধারণতঃ এক বা একাধিক কর্মী সেই লাইট হাউস রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং সন্ধ্যের পর থেকে সারা রাতের জন্য আলো জ্বালিয়ে রাখেন।

আমরা যে লাইট-হাউসটার কথা বলছি সেটা তৈরী হবার পর থেকেই তাকে ঘিরে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

লাইট হাউসটা তৈরী হয়েছিল দ্বীপের মূল ভূভাগ থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা ডুবো পাহাড় ভরা জায়গায় যেখানে কালো মোষের মাথার মতো একটা ছোট পাহাড় উঁচু হয়ে রয়েছে। এটা তৈরী

হবার পর সরকার স্থির করলেন দুজন করে কর্মচারী এক সপ্তাহের যা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী খাবার-দাবার নিয়ে নৌকো করে সেই লাইট-হাউসে উঠবে। এক সপ্তাহ পরে অন্য দুজন তাদের 'রিলিভ' বা ছুটি দিয়ে পরের এক সপ্তাহের জন্য কাজের দায়িত্ব নেবে।

কিন্তু রহস্যের সূত্রপাত শুরু থেকেই।

প্রথম যে দুজন ব্যক্তি তাদের জিনিস পত্তর গুছিয়ে নিয়ে এক সপ্তাহের জন্য লাইট-হাউসে উঠেছিল সপ্তাহ শেষে পরের দুজন গিয়ে তাদের আর খুঁজে পেল না।

তারা নেই! স্রেফ উবে গেছে!

হ্যাঁ, উবেই গেছে বলতে হবে কারণ পরের দুজন এক সকালে গিয়ে প্রথম দুজন কর্মচারীর যা কিছু জিনিসপত্তর মায় পায়ের জুতো জোড়া পর্যন্ত খুঁজে পেল কিন্তু মানুষ দুজনকে কোথাও দেখতে পেল না। এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত নেই তাদের।

দ্বিতীয়বারের কর্মচারীরা অবাক হোল। মূল ভূখণ্ডে এসে সরকারী কর্তৃপক্ষকে খবর দিল। সরকারী অনুসন্ধান হোল কিন্তু প্রথম কর্মচারী দুজনের টিকিও কোথাও দেখা গেল না। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হোল নিশ্চয়ই কোন কারণে তারা লাইট-হাউস ছেড়ে কিংবা মদ-টদ খেয়ে মত্ত অবস্থায় সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা গেছে।

কিন্তু দুজন একই সঙ্গে এসব কাজ করলো! ঠিক যেন বিশ্বাস যোগ্য নয়।

তবু ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়তে দেরী হোল না। দ্বিতীয় দুজনকে ঠিক একইভাবে একদিন পাঠান হোল এক সপ্তাহের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর দিয়ে ওই লাইট-হাউসএর উদ্দেশ্যে।

এক সপ্তাহ বাদে তাদের রিলিভ বা ছুটি দিতে তৃতীয় দুজন গিয়েও দেখে একই ব্যাপার।

এক সপ্তাহ আগে যারা এই লাইট হাউসে ডিউটি দিতে এসেছে তারা রাতারাতি নিরুদ্দেশে।

তারা যা কিছু এনেছিল তা তো পড়ে আছেই এমনকি 'লাইট-হাউস' এর আলোটা পর্যন্ত পরদিন ভোরে আর নেভান হয়নি। অর্থাৎ যেদিন এসেছে তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বেপাত্তা হয়েছে দ্বিতীয় কর্মচারী দুজন।

একি অদ্ভুত রহস্য!

এবার রীতিমত হুলুস্থুল পড়ে গেল। দিনের বেলা সরকারী লোকেরা গিয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালাল লাইট-হাউস আর তার চারপাশে। কিন্তু কোথাও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। তাহলে জলজ্যান্ত চার-চারজন মানুষ গেল কোথায়? কেউ কি এসে গুম্ করে নিয়ে গেছে? কিন্তু তাতে লাভ কি? মানুষ গুলোর যাবতীয় জিনিসপত্তর, টাকাপয়সা, মায় জুতোজোড়া পর্যন্ত সাজান রয়েছে যথাস্থানে। এর অর্থ আচমকা নিরুদ্দেশ হয়েছে চারটে মানুষ।

পুলিস আর অনুসন্ধানকারীর দল পরপর ক'দিন অনুসন্ধান চালিয়ে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। কোথাও কোনো সূত্র নেই। অথচ ঘটনা যে একটা কিছু ঘটেছে তা অস্বীকার করা যায় না। আর কোনো উপায় না দেখে সরকার ওই 'ভুতুড়ে লাইট-হাউস' বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ এভাবে দিনের পর দিন মৃত্যুপুরীতে লোক পাঠিয়ে মেরে ফেলা তো যায় না।

কিন্তু সিদ্ধান্ত কার্যকর হবার আগেই বাধা পড়লো। দুজন তরুণ এসে দেখা করলো সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। একজনের নাম হ্যারিস, অন্যজন পিটার। দুই ভাই। দুজনেই বেশ সপ্রতিভ, বুদ্ধিমান এবং শক্ত সামর্থ চেহারা। ওরা জানাল দ্বিতীয় দলে যাত্রা করে যে অ্যালান নামে কর্মচারীটি নিরুদ্দেশ হয়েছে সে ওদেরই বড় ভাই।

ওরা সরকারী সিদ্ধান্ত কার্যকর হবার আগে একবার সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে চায়।

কোন ভাবেই তাদের বোঝান গেল না। হ্যারিস আর পিটার নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল। ওরা বার বার শুধু একটা কথাই বলতে লাগলো—জগতে কারণ ছাড়া কোন কার্য হয় না। এ রহস্যের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটা কোন দিক আছে যা অনুসন্ধানের হৈ চৈ-এর মধ্যে ধরা পড়েছে না। ওরা তাই শেষবার একটা গোপন অনুসন্ধান চালাতে চায়। আর একাজ যদি তারা না করে তবে তাদের প্রিয় বড় ভাই অ্যালান-এর প্রতি নাকি তাদের কর্তব্য পালন করা হবে না।

এরপর আর কি বলার থাকে ? সরকারী কর্তৃপক্ষকে রাজী হতেই হোল।

দিন দুয়েকের মধ্যেই হ্যারিস আর পিটার একটা মোটর-বোট ভাড়া করে যাত্রা করলো রহস্যময় লাইট-হাউসটার দিকে। ওরা দুজন ছাড়া বোটে ছিল মাত্র চালক। ওদের ইচ্ছে মতো পুলিসী লঞ্চ অনেক পেছনে ঘাপটি মেরে রইল। সমস্ত অভিযানটাই গোপনে এবং নিঃশব্দে হোক—এটাই উদ্দেশ্য।

লাইট-হাউসটার পেছনে পঞ্চাশ গজ মতো দূরত্বে মোটর বোটটা এসে থামলো। ঝলমলে প্রকৃতি, নীল আকাশ, সুনীল সমুদ্র। হ্যারিস আর পিটার দুজনেরই কাছে রয়েছে সেই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম। কোমরে কোল্ট-৩৫ বুলেটের ভারী রিভলবার।

বাইনোকুলারে অনেকক্ষণ চোখে লাগিয়েও লাইটহাউসটার ভেতরে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লো না। নানা ভাবে নানা দিক থেকে পর্যবেক্ষণ চালাল ওরা। সমুদ্রের মাঝে মোষের মাথার মতো জেগে থাকা পাহাড়টার ওপর লাইট হাউসটা নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল হ্যারিস। দুই ভাইয়ের মধ্যে সেই বছর খানেকের বড়। হ্যারিস পিটারকে বললো,—শোন, আমি এখন চুপি চুপি একটা নৌকো নামিয়ে পেছন দিক থেকে ওই লাইটহাউসে

ঢুকবো। তুই মোটর বোট নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর। যদি আমার গুলির শব্দ বা অন্য কোন সংকেত পাস আর অপেক্ষা না করে পেছনের পুলিসী লঞ্চকে খবর পাঠিয়ে নিজে এগিয়ে যাবি। বুঝেছিস ?

দুই ভাইই ডাকাবুকো। তাই হ্যারিস-এর প্রস্তাবে পিটার মোটেই ভয় পেলো না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

হ্যারিস একটা ছোট নৌকা নামিয়ে একাই লাইটহাউসটার দিকে এগিয়ে চললো।

তখন কি ও এ যাত্রার ভয়ঙ্কর পরিণতির কথাটা ভেবেছিল ?

লাইট-হাউসের ভেতর বাইরেটা অনেক ঘুরেছে হ্যারিস কিন্তু এখনও কোন সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি।

লাইট-হাউসের নীচে পাহাড়টার ওপর ও এসে দাঁড়ায়। বিকেলের রোদ পড়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের তলার পাথরও ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। এখানকার পাহাড়ের গা মসৃণ। কারণটা নিশ্চয়ই সমুদ্রে যখন ঢেউ ওঠে ধুইয়ে দিয়ে যায় পাহাড়ের গা। কিন্তু মসৃণ হলেও বেশ কিছু খাঁজ এবং গর্ত চোখে পড়ছে। কাঁকড়া জাতীয় সামুদ্রিক জীব ওসব জায়গায় বাসা বেঁধে থাকা বিচিত্র নয়। দেখতে দেখতে চোখে পড়লো পায়ের কাছে পাহাড়ের ফাটল দিয়ে লম্বামতো কি একটা মাথা তুলেই সট করে আবার লুকিয়ে পড়লো। কাঁকড়া তো নয়। অন্য কোন জাতের সামুদ্রিক জীব নিশ্চয়ই।

হ্যারিস এবার উঠে এল লাইট হাউসটার ওপরে বিদ্যুৎ ঘরটার ভেতরে। সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চাবি নিয়ে এসেছে সুতরাং দোর খুলতে অসুবিধে হোল না। ইতিমধ্যে দিনের আলো কমতে শুরু করছে। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে রাতের অন্ধকার। কি মনে হতে লাইটহাউসের আলোর সুইচগুলো 'অন্' করে দিল হ্যারিস। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বাইরের সামুদ্রিক প্রকৃতি।

এবার কি করবে হ্যারিস ? আর কি দেখার আছে ? যা কিছু

দেখার সবই তো হোল কিন্তু বোঝা তো কিছু গেল না। সব কিছুই স্বাভাবিক। তবে কি করে ওরা এখন থেকে নিরুদ্দেশ হোল…

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কি দেখে থমকে গেল হ্যারিস। ঘরের কোণে ওখানে ওগুলো কি পড়ে রয়েছে ?

দৌড়ে সেখানে গিয়ে হাতে তুলে নিল। এক গোছা বাদামি চুল। মানুষেরই মাথার চুল, নিশ্চয়ই অনুসন্ধানী দলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বাদামী চুলের গোছাটা হাতে নিয়ে হ্যারিসের দাদা অ্যালানের কথাই মনে পড়লো ! দাদার মাথার চুলও ছিল এমনি রুক্ষ আর বাদামী।

কিন্তু চুলের গোছা এখানে এল কি ভাবে ?

তবে কি যারা কোন অজ্ঞাত কারণে নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে সরকারী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা আসলে নিরুদ্দেশ হয়নি—তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কোন পরিণতি ঘটেছে তাদের জীবনে ?

মাথার চুল ছাড়া যে মানুষের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—কোন্ পরিণতি ঘটতে পারে তার ভাগ্যে ? ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়।

হঠাৎ খোলা দরজা পথে চোখ পড়তেই হ্যারিস প্রথমটা বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর এক হিমশীতল আতঙ্কের স্রোত বইতে শুরু করলো ওর মেরুদণ্ড দিয়ে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে কোমর থেকে রিভলবার বার করে ট্রিগার টিপলো—গুড়ুম—গুড়ুম—।

গুড়ুম ! গুড়ুম !

গুলির আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলো পিটার। এতো শুধু সংকেত নয়। নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে হ্যারিস। মোটর-নিয়ে ও দ্রুত ছুটে চললো লাইট হাউস এর দিকে ! সেই সঙ্গে 'বজ্র ওয়ারলেসে' দূরে অপেক্ষমাণ পুলিস লঞ্চকে খবর পাঠাতেও ভুললো না।

লাইট-হাউস এর চত্বরে পা দিয়েই আর একবার চমকে উঠল পিটার।

ওগুলো কি? বাতিঘরের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল হাজারে হাজারে জীব কাল পাহাড়ের গর্ত আর খাঁজগুলো থেকে বেরিয়ে লাইট-হাউসের ভেতর যেন মিছিল করে ঢুকে যাচ্ছে।

লম্বায় এক হাতের বেশী নয়। বুকে হেঁটে চলে। সাপ জাতীয় এক ধরনের আশ্চর্য সামুদ্রিক সরীসৃপ। কিন্তু ওরা এভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে লাইট-হাউসের ভেতরে ঢুকছে কেন? এত সাপ একসঙ্গে কোনদিন দেখে নি পিটার।

আবার গুলির শব্দ। লাইট-হাউসের উপরে যেন পাগলের মতো গুলি ছুঁড়ে চলেছে হ্যারিস।

এতক্ষণে সমস্ত চিত্রটা পিটারের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ওই হিংস্র সরীসৃপ গুলো ওপরে উঠে নিশ্চয়ই ছেঁকে ধরেছে হ্যারিসকে। কিন্তু ওদের ভেতর দিয়ে কি করে ভেতরে ঢুকবে পিটার। সে যে অসাধ্য ব্যাপার।

কিন্তু অসাধ্য সাধন করতেই হবে। যে ভাবে দাদা অ্যালানকে হারিয়েছে আর এক ভাই হ্যারিসকেও একই ভাবে চোখের ওপর মরতে দিতে পারে না সে।

ভারী বুটের তলায় সরীসৃপ গুলোকে মাড়িয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্র পায়ে লাইট-হাউসের ওপর চললো। ইতি মধ্যেই সরীসৃপগুলো ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত লাইট-হাউসটায়।

বিদ্যুৎ ঘরটায় ঢুকেই থমকে দাঁড়াল পিটার। একি বীভৎস দৃশ্য! হ্যারিসের রিভলবারের গুলি শেষ। হিংস্র সরীসৃপগুলো ক্রমেই আরও বেশীকরে ছেঁকে ধরেছে। মাংস খুবলে খাচ্ছে ওর শরীর থেকে, রক্তে মাখামাখি ওর শরীরটা। রক্ত চুঁইয়ে পড়েছে মেঝেতে। এতক্ষণ পাগলের মতো ওই হাজার হাজার হিংস্র সরীসৃপ গুলোর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে হ্যারিস এখন বুঝি অবসন্ন।

ওরা এখন ক্রমেই কোমর ছাড়িয়ে উঠছে পেট, বুক, তারপর আরও ওপরে। চোখ দুটো হ্যারিসের ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মৃত্যুর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে মুখমণ্ডলে। ও টলতে শুরু করেছে—যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে সরীসৃপ ভরা ঘরটার মেঝেতে।

তার আগেই পিটার লাফিয়ে গিয়ে হ্যারিসকে ধরে ফেললো। রাক্ষুসে সাপ জাতীয় সরীসৃপের দল এখন ওকেও ছেঁকে ধরতে শুরু করছে। পিটার আর অপেক্ষা করলো না। কোনরকমে ওদের মধ্যে থেকে হ্যারিসকে টেনে হিঁচড়ে বারকরে আনলো তারপর পাঁজাকোলা করে ধরে নেমে এল নীচে। কয়েকটা সরীসৃপ তখন মাংস কামড়ে ঝুলে রয়েছে ওদের শরীর। অত্যন্ত দ্রুত সে গুলো টেনে ফেলতে লাগলো পিটার।

মোটর বোটের ওপর যখন হ্যারিসের শরীরটা তুলে আনলো সে হ্যারিস জ্ঞানহীন। পিটারের শরীরের মাংসও খুবলেছে ওই রাক্ষস গুলো। তার শরীর থেকেও রক্ত ঝরছে।

ইতিমধ্যে পুলিস-লঞ্চ এসে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিস নেমে পড়েছে বাতি-ঘরের ওই রাক্ষুসে পাহাড়টায়।

হ্যারিসকে অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত বাঁচান যায় নি। ওই রাক্ষুসে সরীসৃপগুলো তার শরীরের জায়গায় জায়গায় মাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত খুবলে খেয়েছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে ও হার মানলো।

হ্যারিস মারা গেলেও এই দুই ভাইই শেষ পর্যন্ত বাতিঘর আতঙ্কের সমাধান করে গেল। আসলে সাপ জাতীয় ওই হিংস্র সরীসৃপ গুলো সমুদ্রের মধ্যে ওই পাহাড়ের খাঁজ আর গর্তে বংশ বিস্তার করে বাস করতো বহুকাল যাবৎ। ওরা প্রচণ্ড হিংস্র এবং মাংসাশী। প্রধানতঃ সামুদ্রিক মাছ আর প্রাণীদের উদরস্থ করেই এতদিন বেঁচে ছিল ওরা। কিন্তু লাইট-হাউসটা তৈরী হবার পর

নতুন তাজা খাবারের সন্ধান পেল। সারাদিন যখন সূর্যের তাপ বেশী থাকতো ওরা পাহাড়ের ফাটলে লুকিয়ে থাকতো। তারপর সন্ধ্যের পর যখন সূর্যের তাপ কমতো ওরা হাজারে হাজারে বেরিয়ে পড়তো খাদ্যের সন্ধানে। এইভাবে 'লাইট-হাউস' তৈরী হবার পর সরকারী কর্মচারীরা যখন আসতো প্রথম রাত্রেই তারা এদের কবলে পড়তো এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই রাক্ষুসে সরীসৃপ গুলো এসে ঝাঁকে ঝাঁকে ছেঁকে ধরে তাদের খুবলে খেয়ে নিঃশেষ করে দিত। একটুকরো হাড় বা শরীরের কোন চিহ্ন পর্যন্ত ফেলে রেখে যেত না। এই ভাবেই নিরুদ্দেশ হয়ে ছিল চার-চারজন হতভাগ্য মানুষ। সরকার অবশ্য এরপর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই পাহাড়ী সরীসৃপ কুল ধ্বংস করার সমস্ত ব্যবস্থাই করেছিলেন। তারা ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গে বাতিঘর আতঙ্কের অবসান হোল।

এরপর সেই বাতি ঘরে প্রথম আলো জ্বালাবার দায়িত্ব যাকে দেয়া হোল—সে পিটার।

তাবপর বহুদিন কেটে গেছে। পিটার আজ বৃদ্ধ। কিন্তু আজও কোন বিষণ্ণ সন্ধ্যায় নাবিকেরা জাহাজ নিয়ে লাইট-হাউসটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পায় লাইট-হাউসের আলোকিত গম্বুজটার নীচে সাদাচুলওয়ালা এক শুভ্রবৃদ্ধ সাগরের জলে উদাসী দৃষ্টি মেলে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নাবিকেরা তখন চুপিচুপি বলাবলি করে, ওই সেই পিটার, একান্ত প্রিয় ভাই এর জীবনের বিনিময়েও যে অনেকগুলো মানুষকে মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে বাঁচিয়েছে।

বাতিঘরের আলো আজও জ্বালিয়ে রেখেছে পিটার।



কায়রো থেকে প্রকাশিত প্রতিটি দৈনিক সংবাদ পত্রের শেষ শহর সংস্করণেই খবরটা বেরুলো। কিছু সময়ের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে।

খবর যেমন বিস্ময়কর তেমনি ভয়ানক।

আগের দিন গভীর রাতে কায়রো শহর যখন নিঃশব্দ নিথর সুপ্তিতে ডুবে আছে ঠিক এমনই সময় ঘুমন্ত শহরের বুকে ঘটে গেছে এক অভূতপূর্ব হত্যাকাণ্ড।

অনুমান হত্যাকারীরা সংখ্যায় অগুন্তি। রাতের অন্ধকারে সঠিক ভাবে তাদের চেনা যায়নি। তবে স্বাভাবিক মানুষের মতো যে তারা নয় এ কথা শোনা গেছে। তারা একই সঙ্গে কায়রোর এক ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় বিভিন্ন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে নিদ্রামগ্ন নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিচারে আক্রমণ চালিয়ে তাদের শরীরের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে গেছে। রক্তহীন ফ্যাকাশে মৃতদেহ গুলি ফেলে রেখে সরে পড়েছে নিঃশব্দে।

একটি বারো বছরের বালক ছাড়া এ ঘটনার অন্য কোন জীবিত প্রত্যক্ষদর্শীও নাকি খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তার মুখ থেকেই শোনা গেছে আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অনেক। কোথা থেকে এসেছিল তা সে বলতে পারিনি—তবে মানুষের মতো হাত পা থাকলেও তারা যে মানুষ নয়, তা তাদের কুচকুচে কালো শরীর আর পিঠের ওপর একজোড়া বিশাল পাখনা দেখলেই বোঝা যায়।

এমন অদ্ভুত আক্রমণকারীর কথা কেউ কি কখনও শুনেছে ?

অনেকেই এ বর্ণনা ভীত বালকটির ভারসাম্যহীন কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু তাতে সমাধান পাওয়া যায়নি। সব চেয়ে বড় কথা—এমন আক্রমণকারীর হদিশ আজ পর্যন্ত কি পাওয়া গেছে, যারা দলবদ্ধ ভাবে রাতের অন্ধকারে গৃহস্থের ঘরে ঢুকে শুধু বাসিন্দা মানুষ গুলির শরীরের সমস্ত রক্ত চুষে নিয়ে সরে পড়ে ?

সব ব্যাপার টাই কেমন অস্বাভাবিক, গোলেমেলে !

এ ঘটনা নিয়ে আলোচনা চললো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মহলে। নানা মত নানা মন্তব্য শোনা গেল—কিন্তু সঠিক উত্তর কেউ পেল না। তারপর কায়রো নগরীর সেইমৃত দুর্ভাগ্যদের আত্মীয়রা ছাড়া সারা পৃথিবীর মানুষ যথারীতি ভুলে গেল এই আশ্চর্য হত্যাকাণ্ডের কথা। ভোলাটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। পৃথিবীতে এখন অনেক সমস্যা—দেশে দেশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা, বর্ণ বৈষম্য, অর্থনৈতিক সংকট।

কিন্তু ঘটনা থেমে থাকলো না।

এবার ঘটনাস্থল কায়রো থেকে অনেক দূরে খোদ নিউইয়র্ক শহর।

উচ্ছল আনন্দে মত্ত রাতের নিউইয়র্ক নগরী তখনও একেবারে ঘুমিয়ে পড়েনি। হঠাৎ শহরের সমস্ত আলোগুলো একসঙ্গে নিভে গেল। চমকে উঠলো সবাই। শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত

হোল নাকি? এমন তো এদেশে সহজে হয় না। তবে কি কোন গুরুতর কারণ ঘটেছে?

সেই গুরুতর কারণটাই তখন ঘটে চলেছে শহরের অন্য অংশে। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে একদল বিচিত্র আক্রমণকারী খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অতর্কিতে পুরো একটা মহল্লায় ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা চিরে নিঃশেষে বার করে নিয়ে গেল সেখানকার তাবৎ প্রাণীর শরীরের রক্ত। তারপর তারা যেমন এসেছিল তেমনিই পালিয়ে গেল কোথাও নিজেদের এতটুকু চিহ্ন মাত্র না রেখে।

এবারের ঘটনার জীবিত প্রত্যক্ষদর্শী একজন মাতাল। নিগ্রো পল্লী 'ব্লাক টাউন' এ পেট পুরে সস্তা মদ গিলে রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে পাশের এক নর্দমায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে উত্থান শক্তি হারিয়ে শুয়েছিল। পর দিন পুলিশের কাছে আক্রমণকারীদের যে বর্ণনা সে দিয়েছে দিন কয়েক আগে কায়রোতে এ ধরনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বালকের বর্ণনার সঙ্গে তা মেলে। আক্রমণকারীরা নাকি কিছুটা মানুষের মতো হাত-পা-ওলা হলেও তারা মানুষ নয়। বরং মনুষ্য আকৃতির বাদুড় বলা যেতে পারে। মিশকালো দেহ, বাদুড়ের মতো মুখ। পিঠের উপর বিরাট দুটো কালো ডানা। ওরা রাতের নিউইয়র্ক শহরের বুকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে কার্য্যসিদ্ধি করে শূন্যপথেই চলে গেছে।

কিন্তু এমন কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? এ তো মাতালের প্রলাপ। তাহলে আসল ব্যাপারটা কি?

আক্রমণকারীদের শারীরিক বর্ণনা যাই হোক, তারা যে গভীর রাতে দলবদ্ধভাবে এসে শহরের নিরীহ মানুষগুলোর ওপর রক্তচোষা বাদুড়ের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ে পৈশাচিক ভাবে নিজেদের রক্ত তৃষ্ণা মিটিয়েছে তা তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

এ ছাড়া আধঘণ্টা সময়ের জন্য সারা শহরের বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্নই বা হোল কি করে? তেমনি কোন কারণ তো ঘটেনি।

আক্রমণকারীদের দ্বারাই যদি একাজ সম্ভব হয়ে থাকে তবে স্বীকার করতেই হবে যে রক্তচোষা হলেও তারা অসাধারণ প্রযুক্তি ক্ষমতার অধিকারী।

রহস্য যত জমাট বাঁধতে লাগলো জল্পনা-কল্পনা-ভাবনারাও ততই লাগাম ছাড়া হয়ে ছুটে চললো।

নানা মুনির নানা মত।

অবশেষে এ কথাই বিভিন্ন মহল মোটামুটি মেনে নিল যে এই আশ্চর্য আক্রমণ আসলে কোন বৃহৎ শক্তির কারসাজি। প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের জনবহুল নগরীতে রাতের অন্ধকারে অদ্ভুত কোন কায়দায় অভিযান চালিয়ে (যা শক্তিশালী রাডার যন্ত্রেও ধরা পড়ে না) সেখানকার মানুষের রক্ত শোষণ করে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে নিজেদের রক্তের ভাঁড়ার গড়ে তুলেছে তারা। হয়তো এটা সেই বৃহৎ শক্তির ভবিষ্যৎ যুদ্ধে নামার এক অন্যতম প্রস্তুতি। রক্তের ভাঁড়ার সমস্ত দেশেই প্রয়োজন অনুপাতে সীমিত।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার অগ্রণী রাষ্ট্রটি যখন মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েই সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ রাষ্ট্রটির দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে শুরু করেছে, ঠিক এমনই সময় "নিউইয়র্ক টাইমস্" এর একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হোল ভারতীয় বিজ্ঞানী স্যার সত্যপ্রকাশের এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী নিবন্ধ।

স্যার সত্যপ্রকাশের অভিমত :—গ্রহান্তর থেকে উড়ে আসা একদল 'বাদুড়-মানুষ' নাকি ঘাঁটি গেড়ে বসেছে আমাদের এই পৃথিবীর কোন অঞ্চলে। বিশ্বের জনবহুল নগরীগুলিতে তারাই নাকি রাতের অন্ধকারে সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালিয়ে রক্ত তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। এই বাদুড়-মানুষেরা শুধু নিশাচরই নয় তারা নাকি ভ্যামপায়ার-এর মতোই রক্ত শোষক—সেই সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তি ক্ষমতার অধিকারী।

প্রথমে ভ্রূকুটি তারপর উপহাস তারপর টিটকিরিতে ফুটিফাটা হোল বিভিন্ন দেশের উন্নাসিকেরা। এমনকি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মানুষগুলো

স্যার সত্যপ্রকাশের আসল উদ্দেশ্য যে মানুষের সঠিক ভাবনাকে বিপথে চালিয়ে দেয়া, এ- মত প্রকাশ করে ওঁকে অন্য শিবিরের দালাল কটূক্তি করতেও ছাড়লো না।

কিন্তু তাদের উপহাস আর গঞ্জনার শব্দ বাতাসে মিশে যাবার আগেই পরবর্তী আক্রমণ ঘটলো সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সর্ব বৃহৎ রাষ্ট্রটির রাজধানীতেই।

গভীর রাতে মস্কো শহরের ঘন বসতি পূর্ণ অঞ্চলে একই ভাবে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চললো। মাত্র আধঘণ্টা সময়ের মধ্যেই শরীরের সমস্ত রক্ত হারিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো কয়েকশো নিরীহ মানুষ। এমন কি সে অঞ্চলের মনুষ্যেতর প্রাণীরাও বাদ গেল না।

এরপরে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানেই ঘটে গেল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এর মধ্যে ভারতের পাটনা শহরটিও ছিল। তখন সেখানে লোডশেডিং চলছে। প্রত্যক্ষদর্শী যে দু'চারজন বিভিন্ন স্থানে প্রাণে বেঁচেছিল তাদের মুখ থেকে আক্রমণকারীদের যে বর্ণনা পাওয়া গেল—কায়রো শহরের সেই বালক কিংবা নিউইয়র্কের মাতালের দেয়া বর্ণনার সঙ্গে তার কোন অমিল নেই।

প্রাণের দায়ে অবিশ্বাসী উন্নাসিকদের কুঁচকানো নাক এবার সিধে হোল।

বিশ্ব জনমতের চাপে রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ অধিবেশনে বিষয়টা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা চললো এবং অবশেষে এই ভয়াবহ নিশাচর আক্রমণ কারীদের বিনাশ করার জন্য একটা পৃথক "সেল" গঠন করা হোল

কিন্তু দিন কয়েক তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েও এই আশ্চর্য ক্ষিপ্র এবং সংঘবদ্ধ আক্রমণকারীদের টিকিটিও তারা ছুঁতে পারলো না। রাতের অন্ধকারে ওরা যেন আসে দুরন্ত ঘূর্ণি ঝড়ের মতো, চলেও যায় তেমনি। পেছনে রেখে যায় শুধু হতভাগ্যদের মৃতের স্তূপ।

অবশেষে প্রাণের দায়ে মান খোয়াতেও রাজী হলেন বিশ্বের বিজ্ঞানীকুল ও নেতৃবৃন্দ।

'সেল' এর উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হলেন এক ভেজাল দেশের নির্ভেজাল বিজ্ঞানী স্যার সত্যপ্রকাশ।

স্যার সত্যপ্রকাশ এ খবর যখন শুনলেন তখন রাজস্থানের রতনপুরে তিনি তাঁর নিজস্ব গবেষণাগারে চামচিকে আর বাদুড় নিয়ে কোন গভীর গবেষণায় মগ্ন। তাঁকে এতবড় একটা সম্মানে ভূষিত করেছেন বিশ্বের সবজান্তা বিজ্ঞানীরা, যাঁরা দিন কয়েক আগেও ব্যঙ্গ আর কটূক্তি বর্ষণ করেছেন—শুনে প্রথমটা অবাকই হয়েছিলেন। তারপর হেসে বলেছিলেন, সমগ্র বিশ্বের এ বিপদে তাঁর পক্ষ থেকে সব রকম সহযোগিতাই তিনি করবেন। এজন্য তাঁকে বিশেষ সম্মান-পদ না দিলেও চলবে।

কিন্তু ততদিনে উন্নাসিকদের নাক অনেকটা ঝুলে পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত রাজী হতেই হোল বৃদ্ধকে।

তার পর দিন থেকেই কাজে নেমে পড়লেন।

প্রথম কাজ হোল সেই বিচিত্র আক্রমণকারীদের আক্রমণের চরিত্র বিশ্লেষণ করা, সেই সঙ্গে তাদের ঘাঁটিটাকে খুঁজে বার করা।

তার আগে এক আলোচনা চক্রে প্রখ্যাত মার্কিন প্রাণীতত্ত্ববিদ ডক্টর নিকোলাই কেসি স্যার সত্যপ্রকাশকে প্রশ্ন করে ছিলেন, আক্রমনকারীরা যে গ্রহান্তরের জীব এবং বাদুড় জাতীয় এক বিশেষ ধরনের মনুষের দল, এ সিদ্ধান্ত তিনি করলেন কি করে?

উত্তরে স্যার সত্যপ্রকাশ তাঁর সঙ্গের ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা খাম বার করতে করতে বললেন,—ব্যাপারটা কিছুটা ভাগ্যক্রমেই জানতে পেরেছি। যেদিন রাতে নিউইয়র্ক শহরের ওপর আক্রমণটা ঘটেছিল, তার দিন কয়েক আগে থেকে আমি ওই শহরেই এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বন্ধুর গবেষণা ভবনে আকাশ সম্পর্কে কিছু আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম।

সে রাত্তিরেও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে তাকিয়ে ছিলাম দূর আকাশে। হঠাৎ নজরটা পড়লো উত্তর আকাশের দিকে। ঝাঁক বেঁধে কি যেন উড়ে আসছে না? প্লেন বা পাখীর ঝাঁক তো মনে হচ্ছে না। দূরবীনের লেন্স এ্যাডজাস্ট করে ফোকাস করতেই পরিষ্কার হোল। লম্বালম্বা ডানায় ভর করে উড়লেও কোন নিশাচর প্রাণী ওরা নয়। মুখ আর ডানা বাদুড়ের মতো হলেও চেহারাটা ওদের মানুষের মতো। ওরা নেমে আসছে নিউইয়র্কশহরের ওপর। সেই মুহূর্তে আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব ছিলনা, শুধু ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা ভেবে তক্ষুনি কাগজ কলমে চটপট ওই বাদুড়-মানুষদের কয়েকটা স্কেচ করে ফেলেছিলাম। বলতে বলতে খামটা উপস্থিত সদস্যদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন স্যার সত্যপ্রকাশ।

খামের মধ্যে হাতে আঁকা কয়েকটা উড়ন্ত বাদুড়-মানুষের ছবি। এমন প্রাণী সত্যিই পৃথিবীতে কেউ কখনও আগে দেখেনি।

বাদুড়-মানুষের ঘাঁটিটা খুঁজে পাওয়া গেল কিছুটা অভাবিত ভাবেই।

গ্রীনল্যাণ্ড দেশটা চির বরফ ঢাকা পৃথিবীর উত্তর মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি। এখানে বছরে প্রায় ছ' মাস দিন ছ' মাস রাত।

গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তর অঞ্চলে ওই বরফ রাজ্যে সিনেমার শুটিং তুলতে গিয়েছিলেন হলিউডের একদল সাহসী ছায়া চিত্র শিল্পী।

ওরা যখন ওখানে পৌছলেন গ্রীনল্যাণ্ডে দীর্ঘস্থায়ী রাত্তির শুরু হয়ে গেছে। আকাশের বুকে, মেরুজ্যোতির আশ্চর্য রঙের বর্ণালী। এই সুন্দর দৃশ্যাবলী রঙিন ছবির বুকে তুলে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেয়াই ছিল পরিচালকের মূল উদ্দেশ্য।

স্থানটা মেরু জ্যোৎস্নায় হাল্কা আলোকিত। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বরফ আর বরফ। মাঝে মাঝে উচুঁ উচুঁ বরফের পাহাড়।

এ দিকটায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে এস্কিমোরা পর্যন্ত বাস করে না।

পরিচালক নির্দেশ দিলেন খুব কম সময়ের মধ্যে চটপট এখানকার কাজ সেরে চলে যেতে হবে।

সেই মতো শিবির গড়ার ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই লোকেশন রেডি করা হোল, একটা সায়েন্স ফিকশন থ্রিলার ছবি। পৃথিবীর মহাকাশচারী নায়ক আর নায়িকার এক বরফ গ্রহে অবতরণের দৃশ্য।

নিকটবর্তী তুষার ঢিবিটাতে নায়ক নায়িকা মহাকাশচারীর পোষাকে সেজে উঠে দাঁড়াল। শট্ শুরু হবে মহাকাশচারীদের গ্রহে অবতরণের মুহূর্ত থেকে।

আসল ঘটনা শুরু হোল আরও কিছুটা পর।

ইতিমধ্যে মডেল মহাকাশযানটা একটু দূরেই স্থাপন করা হয়েছে। লাইট, ক্যামেরা, সাউণ্ড-বক্স সব কিছু রেডি। ইউনিটের অন্যান্য অভিনেতা টেকনিসিয়ানরা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে।

সহকারী পরিচালক শেষবারের মতো নায়ক নায়িকাকে সংলাপ পড়িয়ে এলেন। মেক-আপ ম্যানও তার তুলির শেষ ছোঁয়াটুকু দিয়ে গেলেন।

ক্ল্যাপস্টিক পাঠ হোল···লাইট...ষ্টার্ট ক্যামেরা···এ্যাকসন!

আক্রমণটা ঘটলো ঠিক সেই মুহূর্তে। অত্যন্ত আকস্মিক সেই হিংস্র আক্রমণ।

প্রথমেই যেটা তুষার ঢিবি মনে করা হয়েছিল সেটার এক অংশ সরে গিয়ে এক গহ্বর সৃষ্টি হোল। নায়ক আর নায়িকা দুজনেই হারিয়ে গেল তার মধ্যে। তার পরই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক আশ্চর্য প্রাণী। তাদের শরীরটা হাত-পা-ওলা মানুষের মত কিন্তু মুখটা বাদুড়ের মত। গায়ের রং কুচকুচে কালো। পিঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে এক জোড়া বড় ডানা।

ওরা বেরিয়ে এল না বলে উড়ে এল বলাই উচিত। এরাই সেই বিস্ময়কর বাদুড়-মানুষের দল। আর যেটাকে তুষার ঢিবি মনে করা হয়েছিল সেটা আসলে ওদেরই ঘাঁটি। পুরু বরফে ঢাকা থাকায় চেনা যায়নি।

অতর্কিত আক্রমণে একটা প্রাণীকেও জীবিত রাখলো না তারা।

ঘটনাটা জানা গেল দুর্ঘটনার দিন কয়েক পর অনুসন্ধানী দল যখন হলিউডের এই সিনেমা কোম্পানীর খোঁজ নিতে নির্দিষ্ট লোকেসনে হাজির হোল।

চির তুষার রাজ্যে কোন কিছুই সহজে নষ্ট হয় না। দেখা গেল পুরো দলের সারি সারি মৃতদেহ পড়ে আছে—কিন্তু ওদের কারুর শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই।

ঘটনার বিবরণ পাওয়া গেল আশ্চর্য উপায়ে। আক্রমণটা ঘটেছিল শুটিং শুরু হবার পর। ক্যামেরা তখন ছবি তুলতে শুরু করছে। ক্যামেরা কেউ বন্ধ করেনি। স্বভাবতই সমস্ত হত্যালীলার দৃশ্যই ক্যামেরা তার ফিল্মের শেষ অংশটুকুতে পর্যন্ত ধরে রেখেছে লেন্সের চোখে দেখে।

এই সেলুলয়েডের রীলটাই হৈ-চৈ ফেলে দিল বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে।

বাদুড়-মানুষের অস্তিত্ব এতদিনে প্রমাণিত হল সুনিশ্চিত-ভাবে।

পৃথিবীর বুকে এমন জীবের অস্তিত্ব যখন সম্ভব নয় তখন ওরা যে গ্রহান্তরের আগন্তুক এ-কথা মানতে চরম অবিশ্বাসীরাও এবার আর আপত্তি করলো না। গ্রহান্তরের ভ্যামপায়ার গোষ্ঠীর এই উন্নত প্রযুক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন হিংস্র প্রাণীগুলি বর্তমানে ঘাঁটি গেড়েছে দীর্ঘ অন্ধকারের দেশ গ্রীণল্যাণ্ডের চির তুষার রাজ্যে।

এদের চটপট বিনাশ করতে না পারলে আগামী দিনে সারা পৃথিবীর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

হয়তো আরও ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে সারা পৃথিবীর প্রাণীজগতের রক্ত চুষে শ্মশান করে দেবে এই ধারিত্রীকে।

অতএব কাল বিলম্ব না করে অভিযান শুরু হোল তুষার রাজ্য গ্রীণল্যাণ্ডে।

কিন্তু যতটা সহজ ভাবা হয়েছিল দেখা গেল কাজ মোটেই তত সহজ নয়।

এক আশ্চর্য শক্তিশালী চুম্বক বেষ্টনীতে ওরা ঘিরে রেখেছে সারা মহাকাশযান।

হ্যাঁ, ঘাঁটিটা আসলে ওদের মহাকাশযান—যার সাহায্যে গ্রহান্তর থেকে ওরা উড়ে এসেছে এই পৃথিবীর বুকে।

রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর কিছু কিছু অধৈর্য রণনায়কের কাছ থেকে প্রস্তাব এল নিউক্লিয়ার মিশাইল প্রয়োগ করা হোক বাদুড় মানুষদের তুষার ঘাঁটির ওপর।

বাধা দিলেন স্যার সত্যপ্রকাশ। তার মতে, ও এলাকার যুগ যুগান্তর ধরে জমে থাকা বরফ প্রচণ্ড উত্তাপ সঞ্চারে গলতে শুরু করলে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে পৃথিবীর বুকে। ভাসমান হিমশৈলী, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন ছাড়াও সমুদ্র জলের উচ্চতার কিছুমাত্র হেরফের হলেও সমুদ্র নিকটবর্তী অনেক ভূখণ্ডই চলে যাবে সাগর গর্ভে।

এক বাক্যে এ কথা মেনে নিলেন বিশ্বের সমুদ্র বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু তাহলে ওই ভয়ঙ্কর বাদুড় মানুষদের হাত থেকে বাঁচাবার উপায়ই বা কি?

উপায় বার করলেন স্যার সত্যপ্রকাশই।

যে পদ্ধতিতে তিনি গ্রহান্তরের উন্নত কারিগরী ক্ষমতা সম্পন্ন ওই সব পিশাচ-বাদুড়-মানুষদের পৃথিবী ছাড়া করলেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব।

বাদুড়-মানুষদের একমাত্র দুর্বল ক্ষেত্রটিতেই আঘাত হানলেন তিনি।

বাদুড়-মানুষেরা নিশাচর। দিনের আলোয় তারা সম্পূর্ণ অসহায়, পৃথিবীর বাদুড় জাতীয় প্রাণীকুলের মতো তারাও আলোকে ভয় পায়। এবং রাতের পৃথিবীতে উড়ে বেড়ায় নিজেদের ডানার একধরনের কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দের প্রতিঘাত অনুসরণ করে।

ওদের এই বিশেষ দুর্বলতাটুকু ধরে ফেলেছিলেন স্যার সত্যপ্রকাশ।

এবং তারপরই উত্তরমেরু অঞ্চলে গ্রীনল্যাণ্ডের দীর্ঘ রাতের আকাশে তুলে দিলেন এক কৃত্রিম ক্ষুদে সূর্য।

মানুষের দ্বারা কি ভাবে এই কৃত্রিম ক্ষুদে সূর্য সৃষ্টি সম্ভব সে জটিল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে আপাততঃ শুধু এটুকুই বলা যায় যে আজকের উন্নত দেশের বিজ্ঞানীকুল আলো এবং শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য ইতিমধ্যেই দেশে দেশে কৃত্রিম সূর্য গঠনে তৎপর হয়ে পড়েছেন। পরিকল্পনা করছেন নিয়ন্ত্রিত সংযোজন চুল্লীতে অত্যন্ত উষ্ণ প্লাজামা মাধ্যমে নিউক্লিয় সংযোজন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন করে দ্বিতীয় ক্ষুদে সূর্য বানাবার।

স্যার সত্যপ্রকাশ এই পরিকল্পনা মাফিকই অত্যন্ত দ্রুত প্লাজামার মধ্যে নিউক্লিয় সংযোজন পদ্ধতিতে এক অভিনব সূর্য সৃষ্টি করে স্থাপিত করলেন তুষার ভূমির অন্ধকার আকাশে।

দূরীভূত হলো উত্তর মেরুর অন্ধ অমানিশা,

আলোয় ঝলমল করে উঠলো গ্রীনল্যাণ্ডের প্রকৃতি। এই অকাল সূর্যোদয়ের দৃশ্যে অবাক হয়ে ইগলু বাসভূমি থেকে বেরিয়ে এল দক্ষিণ গ্রীনল্যাণ্ডের বাসিন্দা এস্কিমোরা। অকাল বসন্তের ছোঁয়া লাগালো তুষার রাজ্য।

কিন্তু সরষেফুল দেখলো গ্রহান্তরের সেই বাদুড়-মানুষের দল। বাইরের আলোর রাজ্যে তাদের বেরুবার উপায় নেই। মহাকাশ-যানে শুধু বন্দী হয়ে থাকা।

এভাবে চললো দিনের পর দিন। ইতিমধ্যে আকাশযান ঘাঁটিতে বাদুড়-মানুষদের খাদ্য ভাণ্ডার শূন্য। শুরু হয়ে গেছে অনাহার। রক্ত চাই—তাজারক্ত। এছাড়া অন্য কিছুতে খিদে তেষ্টা মেটেনা ওদের। কিন্তু মাথার ওপর ওই কৃত্রিম সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল প্রকৃতিতে কি করেই বা ঝাঁক বেঁধে বেরুবে ওরা রক্ত আহার অন্বেষণে?

তার মানে যতটা বোকা নিরীহ ভাবা গিয়েছিল এ গ্রহের মানুষ-গুলোকে তা তারা নয়। রীতিমত বিপজ্জনক এবং ফাঁদে ফেলতে ওস্তাদ।

কৃত্রিম ক্ষুদে সূর্য গ্রীনল্যাণ্ডের মাথায় স্থাপন করার ঠিক একুশদিনের দিন একটা কালো গোলাকৃতি আকাশযান গ্রীনল্যাণ্ড-এর তুষার ভূমির ভেতর থেকে মাথা তুলে ক্ষিপ্রগতিতে উড়ে মিলিয়ে গেল অসীম আকাশে।

রাষ্ট্রসংঘ সমেত সমস্ত উন্নত দেশের নিজস্ব টি ভি পর্দায় এ দৃশ্য যখন ভেসে উঠলো—আনন্দে যে যার আসনে লাফিয়ে উঠলেন বিশ্বের বিজ্ঞানীরা। পৃথিবী রক্ষা পেয়ে গেছে।

এর পর এ কাহিনীর আর লেখার কিছু থাকে না। তবে শোনা গেছে রাষ্ট্র সংঘ বিজ্ঞান পরিষদ নাকি স্যার সত্যপ্রকাশকে তাঁর এই বিরাট কৃতিত্বের জন্য বিশ্ববাসীর পক্ষ থেকে বিপুল ভাবে সম্মানিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা নাকি তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে শুধু একটা আবেদনই রেখেছেন—রাষ্ট্রসংঘের আর্থিক সহযোগিতায় যে কৃত্রিম ক্ষুদে সূর্যটা স্যার সত্যপ্রকাশ তৈরী করেছেন তা যদি তাঁকে নিজের দেশ ভারতের কল্যাণে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয় তাহলেই তিনি সব থেকে বেশী কৃতার্থ বোধ করবেন। কারণ আমাদের এই হতভাগ্য গরীব দেশের ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা

মেটাতে এখন একটি কৃত্রিম ক্ষুদে সূর্য তৈরীর আর্থিক সংগতি আজও আমাদের হয় নি।

স্যার সত্যপ্রকাশের এ আবেদন রাষ্ট্রসংঘ সাড়া দেবেন কিনা জানি না—কিন্তু কথাটা শুনতে শুনতে আমার। মনে হয়েছে এই ভেজাল দেশের নির্ভেজাল বিজ্ঞানীটির সত্যিই জুড়ি নেই!

— শেষ —